# ইসলাম কি এ যুগে অচল

মুহম্মদ কুতব

মুহম্মদ কুতুব

# ইসলাম কি এ যুগে অচল ?



অধ্যাপক আবদুল গফুর
অনূদিত



ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলাম কি এ যুগে অচল : মুহম্মদ কুতুব ; অধ্যাপক আবদুল গফুর অনূদিত ॥ ইফাবা প্রকাশনা : ১৬০৮ ॥ ইফাবা গ্রন্থাগার : ২০০.৯ ॥ প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬, শাওয়াল ১৪০৯, মে ১৯৮৯ ॥ প্রকাশক : ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ ॥ প্রচ্ছদ শিল্পী : কৌশিক কাদের ॥ মুদ্রণে : পূর্ববঙ্গ প্রেস, জিন্দাবাহার দ্বিতীয় লেন, ঢাকা—১১০০ ॥ বাঁধাইয়ে : জামিল এন্টারপ্রাইজ, ৬৪, আর. কে. মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা ॥

মূল্যঃ ষোল টাকা

ISLAM KEE E JUGE ACHAL : (Is Islam Backdated ?) written by Muhammad Kutb in English and translated by Prof. Abdul Ghafur and published by Farid Uddin Masoud, Publication Director, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka—1000.

May 1989

Price : Tk. 16·00 : U.S. $ : 1·00

# প্রকাশকের কথা

ইসলাম যুগ-প্রতিভূ ধর্ম। এ ধর্ম শাশ্বত যুগের শাশ্বত কালের। নতুন যুগের সূচনায় এর নতুনত্ব বিনষ্ট হয় না বরং নতুন যুগের সামনে এ নতুন তাৎপর্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠে। এর কারণ মানব জীবনের সর্বপ্রকারের সমস্যার সমাধান এতে নিহিত রয়েছে। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি সমস্যার সমাধান দিতে ইসলাম প্রায় নিশ্চিন্তভাবে সচেতন থেকেছে। নতুন নতুন বিজ্ঞান ও দর্শনের আবির্ভাবে মানুষের কতকগুলো মৌলিক সমস্যা বিলুপ্ত হয়ে যায় না—ইসলাম এই চিরন্তন মৌলিক সমস্যাগুলোর উপর ভিত্তি করে তার সমাধানের নীতিমালা গড়ে তুলেছে। সে জন্যেই ইসলাম চির নতুন চির অমর—শত পরিবর্তনের মধ্যেও তাই সে অপরিবর্তনশীল। বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহম্মদ কুতুব তাঁর বর্তমান গ্রন্থে সেটাই অপূর্ব দক্ষতায় এবং ব্যাখ্যা দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন।

বর্তমানে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার চক্রান্তকারীরা আদর্শ ইসলামের সত্যকে বিলুপ্ত করার যে চেষ্টা করেছে মুহম্মদ কুতুবের এই ব্যবস্থা এর দারুণ প্রতিবাদ। আমাদের দোদুল্যমান চিত্ত বিশ্বাসীদের এই ব্যাখ্যা জানার একান্ত প্রয়োজন বলে ইফাবা এটি পুনঃ প্রকাশ করছে। প্রফেসর আবদুল গফুর প্রাঞ্জল ভাষায় বইটি অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

# অনুবাদকের কথা

মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী মনীষী মুহম্মদ কুতুবের রচিত সাড়া-জাগানো গ্রন্থ 'ইসলাম দি মিসআণ্ডারস্টুড রিলিজিয়ন' ১৯৬৯ সালে আমি অনুবাদ করি মরহুম ডঃ হাসান জামানের অনুরোধে। ডঃ জামান তখন অধুনালুপ্ত ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশনের পরিচালক। ব্যুরো ১৯৭০ সালে এই অনুবাদ প্রকাশ করে। হয়ত স্বল্প আয়ের পাঠকদের ক্রয়ের সুবিধার্থেই এই পুস্তকের এক-এক অধ্যায় এক-একখানি পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক ক্ষুদ্র অধ্যায় মিলেও একখানি পুস্তিকা করা হয়। সে যাই হোক, কবি ফারুক মাহমুদের পূর্বাচল প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত এই সব পুস্তিকা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের ব্যাপক পরিবর্তনের ডামাডোলের মধ্যে সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেও পরবর্তীতে এর অনেকগুলিই হারিয়ে যায়। মাত্র ছয়-সাতখানি পুস্তিকা শেষ অবধি আমার হেফাজতে ছিল। ওগুলো আশির দশকের প্রথম দিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়। ঐ পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকাগুলো সংরক্ষণের এবং একত্রে পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পরবর্তীকালে একত্রে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই বর্তমান পুস্তক দিনের আলো দেখতে যাচ্ছে।

এই গ্রন্থে আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার আলোকে ইসলামের বিরূপ সমালোচকদের বিভিন্ন কুযুক্তি লেখক যেমন যোগ্যতার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন, তার সবটুকু কৃতিত্বই তাঁর। আমি শুধু তাঁর রচনা ইংরেজী থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছি। মূল রচনার বক্তব্য সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে অনুবাদে সাবলীলতা আনতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। একাজে কতটুকু সফল হয়েছি তা বিচার করবেন বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আমার এই গ্রন্থ বর্তমান অবয়বে প্রকাশ করতে এগিয়ে আসায় আমি ফাউণ্ডেশনের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে যাজায়ে খায়ের এনায়েত করুন এবং এই গ্রন্থ অনুবাদে শ্রম ব্যয়ের অছিলায় এই অধমের সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করুন—এ মুহূর্তে এটাই আমার একান্ত মুনাজাত।

ঢাকা
৬ এপ্রিল, ১৯৮৯

আবদুল গফুর

## সূচীপত্র

# ইসলাম কি এ যুগে অচল ?

# ইসলাম কি এ যুগে অচল ?

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আজ এক ধর্মীয় সমস্যার সম্মুখীন। ধর্ম কি প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোন বাস্তব সত্য? অতীতে হয়ত তা সত্য ছিল, কিন্তু আজকের বিশ্বে বিজ্ঞান যখন সমগ্র জীবন-ধারাকে পাল্টে দিয়েছে এবং জীবনে আজ যখন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুমোদনের বাইরে কোন কিছুর স্থান নেই, তখনও কি সেই মর্যাদা দাবী করতে পারে? ধর্ম কি মানবতার কোন প্রকৃত প্রয়োজনের প্রতিনিধিত্ব করে? না এটা ব্যক্তির মজ্জাগত গঠনের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল? কারণ, এর বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে আদপে যদি কোন পার্থক্যই থাকে তবে মানুষ একে বিশ্বাস না করেও চলতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও তারা এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যার সম্মুখীন হন। ইসলামের সমর্থকগণ বলেন, ইসলাম শুধু একটা ধর্ম মাত্র নয়, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন বা মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের নামও ইসলাম নয়, বরং এ এমন একটা সুসমঞ্জস ব্যবস্থা, যার মধ্যে রয়েছে একটি ইনসাফসম্মত অর্থনৈতিক বিধান, একটি সুসংহত সমাজ সংগঠন, দেওয়ানী, ফৌজদারী ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা, দৈহিক বিধান সহ জীবনের প্রতি একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর প্রত্যেকটি উৎসারিত হয়েছে ইসলামের মূল মর্মবাণী এবং উহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা থেকে। এই সব 'শিক্ষিত' লোকেরা যখন ওসব কথা শোনেন তখন বেশ ফ্যাসাদে পড়েন। কেননা তারা ধারণা করে নিয়েছেন যে, ইসলাম বহু পূর্বেই মরে গেছে, কারণ ইহা সেকেলে হয়ে গেছে এবং এর প্রয়োজনীয়তাও নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এজন্যেই প্রত্যয়শীল মুসলমানদের এরা যখন বলতে শোনেন যে, ইসলাম সুদূর অতীতের কোন ব্যাপার নয়, এটা মৃত বা সেকেলেও নয়, বরং আজকের দিনেও এটা একটা জীবন্ত ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা—কারণ এর মধ্যে জীবনের এমন সব উপাদান রয়েছে, যা সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমসহ মানবতার পরিজ্ঞাত কোন ব্যবস্থাতেই নেই—তখন তারা তাজ্জব বোধ করেন।

এ পর্যায়ে তাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না—তারা অধৈর্য হয়ে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারকদের উদ্দেশ্যে দাঁত কিড়মিড় করে বলে ওঠেন: তোমরা কি এসব কথা

সেই ধর্ম সম্পর্কে বলতে চাও যা দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রকে সমর্থন করে—যে ব্যবস্থা নারীকে আধা-মানুষ করে সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে; যা প্রস্তরাঘাতে হত্যা, হাত কাটা ও বেত্রদণ্ডের বিধান দেয়; যা ধনিক-সহ বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজকে বিভক্ত করে; যা মেহনতী জনতার মর্যাদা-জনক জীবনের কোন নিশ্চয়তা দান করে না এবং যা হেন করে না তেন করে না ইত্যাদি—এরূপ ব্যবস্থা ভবিষ্যতে টিকে থাকা তো দূরের কথা, বর্তমান যুগেই বা তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকার সম্ভাবনা কোথায়? বিজয় ও সাফল্যের কথা দূরে থাক—এরকম একটি ব্যবস্থার পক্ষে আধুনিক যুগের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের কঠোর আঘাত মুকাবিলা করবার শক্তি কোথায়?

এ আলোচনায় অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমরা একটু থামব এবং বুঝে দেখতে চেষ্টা করব, এইসব 'শিক্ষিত' সন্দেহবাদী কারা? এবং সন্দেহবাদের মূল কোথায়? এই মনোভাব কি তাদের স্বাধীন চিন্তার ফল, না না-বুঝে অন্যের ধার-করা বুলি তোতা পাখীর মত তারা আওড়াচ্ছে?

আসল ব্যাপার হলো, এই সব ভদ্রলোকের এই সন্দেহবাদ মোটেই তাদের স্বাধীন চিন্তার ফল নয়, আর এর জন্মও তাদের মগজে ঘটেনি। এর প্রকৃত উৎসের জন্য আমাদের আধুনিক ইতিহাসের কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে দেখতে হবে।

মধ্যযুগে ইউরোপ ও মুসলিম প্রাচ্যের মধ্যে অসংখ্য ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় দলের মধ্যে বহু রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে এবং তারপর একটি সময় আসে যখন তাদের প্রকাশ্য সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাদের সংঘাত যে তখনও সমাপ্ত হয়নি, তা বোঝা যায় লর্ড এ্যালেনবীর একটি উক্তি থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বৃটিশ ফৌজ কর্তৃক জেরুসালেম দখলের পর লর্ড এলেনবী নির্মম ভঙ্গীতে উক্তি করেছিলেন: "আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল।"

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, বিগত দুই শতাব্দী ধরেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রয়েছে। তৌফিকের বিশ্বাসঘাতকার সুযোগে ১৮৮২ সালে বৃটিশ শক্তি মিসরে প্রবেশ করে। আরাবীর নেতৃত্বে পরি-চালিত গণ-আন্দোলন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তারা তার সাথে মিসরে সামরিক দখল কায়েমের ষড়যন্ত্র পাকায়। এর পর থেকে একটি মাত্র লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই বৃটিশ নীতি আবর্তিত হতে থাকে, সেটি হল—মুসলিম বিশ্বে তাদের কব্জা আরও মজবুত করা এবং প্রাচ্যের ইসলামী ভাবাদর্শের বন্যায় তাদের কায়েমী স্বার্থ

পাত্তে জেগে না যায় তার খবরদারী করা। এই প্রসঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ গ্লাডস্টোন হাউস অব কমন্সে যে উক্তি করেছিলেন, আমরা তারও উল্লেখ করতে চাই। পবিত্র কুরআনের একখণ্ড হাতে তুলে ধরে হাউসের সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন; "যতদিন পর্যন্ত মিসরবাসী এই গ্রন্থ আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন আমরা কিছুতেই সেদেশে শান্তির মুখ দেখব না।"

স্বাভাবিক কারণেই বৃটিশের প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়াল ইসলামী আইন-কানুনকে বিকৃত করা, মুসলমানদের অন্তর থেকে এর প্রতি শ্রদ্ধানুভূতি দূর করে দেওয়া এবং ইসলামকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করা, যাতে করে মুসলমানেরা একে হেয় চক্ষে দেখতে শুরু করে এবং পরিণামে সম্পূর্ণরূপে একে বর্জন করে। তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্যেই তারা এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল।

মিসরে তারা যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে তার ফলস্বরূপ ছাত্রগণ ইসলামের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়। অবশ্য এটুকু তাদের জানতে দেওয়া হল যে, ইসলাম নামে একটি ধর্ম আছে যা ইবাদত, নামায-রোযা, তসবিহ-তাহলিল, যিকির-আযকার, মারেফত ইত্যাদি শিক্ষা দেয়; কুরআন নামক একখানি কিতাব আছে, যা তিলাওয়াত করলে সওয়াব হাসিল করা যায়; তাছাড়া ইসলাম ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতা ও দান-খয়রাতের তাকিদ দেয়। ইসলামকে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে বা শাসনতন্ত্ররূপে এদেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক নীতির ভিত্তি হিসাবে বা শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বা একটি জীবনব্যবস্থা হিসাবে অথবা জীবনের নিয়ামক রূপে বুঝতে ছাত্রদেরকে কোন সুযোগই দেওয়া হল না। পরিবর্তে বিভিন্ন ইউরোপীয় ওরিয়েন্টালিস্ট ও অন্যান্য শিক্ষকবিদগণ ইসলাম সম্বন্ধে যেসব বিরূপ মন্তব্য করেছেন তা তাদের শেখানো হল। এ সবের উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুসলমানরা তাদের ধর্ম বর্জন করে এবং সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধির সহজ শিকারে পরিণত হয়।

তাদের শেখানো হল জগতের একমাত্র নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থা ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা, ইউরোপীয় দার্শনিকদের উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই একমাত্র খাঁটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; আর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইউরোপবাসী যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে সেটাই হল সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও নিখুঁত রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাদের শিক্ষা দেওয়া হল, ফরাসী বিপ্লবই মানবাধিকারের সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়, ইংরেজ জাতিই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়ে এর ব্যাপক প্রচার সাধন করে; এবং রোমানরাই পৃথিবীতে সভ্যতার প্রাথমিক ভিত্তি নির্মাণ করে। এক কথায়,

বৃটিশগণ ইউরোপকে এমন এক বিদ্রোহী ও দুর্দান্ত শক্তিমান রূপে চিত্রিত করে যার সামনে দাঁড়ানো বা যার অগ্রগতিতে বাধ সাধা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর প্রাচ্যকে তারা চিত্রিত করল দীনহীন এমন এক রূপে, যার নিজস্ব কোন মূল্যবোধ নেই এবং ইউরোপের গোলামী করা ও তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী নকল করা ছাড়া যার কোন গত্যন্তর নেই।

এই রাজনৈতিক পলিসির সুফল অবশেষে ফলতে লাগল। নিগরবাসীদের মধ্যে এমন একদল 'শিক্ষিত' লোক সৃষ্টি হল যারা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীন সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ভাবনা-চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। তারা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপের শিষ্য বনে গেল; তারা নিষ্ঠার সাথে তার পূজা শুরু করল; নিজেদের চোখে দেখা তাদের বন্ধ হয়ে গেল, স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলল; তারা শুধু তাই দেখতে লাগল যা ইউরোপীয়ানরা পছন্দ করত; চিন্তাও করতে লাগল তাদেরই মর্জি মাফিক।

এ দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের রাজনৈতিক চক্রান্ত-জাল বিস্তার করে যা হাসিল করতে চেয়েছিল আজকের 'শিক্ষিত' বুদ্ধিজীবিগণ সেই উদ্দেশ্যেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

এই হতভাগ্য ব্যক্তিগণ ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ইউরোপীয় ওস্তাদদের শিখিয়ে দেয়া বুলি ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে তাঁরা আর কোন কিছুরই খবর রাখেন না। এ জন্যেই ওদের সুরে সুর মিলিয়ে তারস্বরে এরা চীৎকার করে চলেছেন, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে এবং বিজ্ঞানকে ইসলাম থেকে আলাদা করতে হবে।

নিজেদের অজ্ঞতা হেতু তাঁরা এ সত্যটি ভুলে যান যে, ইউরোপ যে ধর্মকে নির্বাসিন দিয়েছে এবং ইসলামী আদর্শের প্রবক্তাগণ যার দিকে জনসাধারণকে আহ্বান জানান এ দু'টি বস্তু এক নয়, আর ইউরোপ যেদিন ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সেদিন সেখানে যে বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা পৃথিবীর সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ধরনের কোন পরিস্থিতির উদ্ভব মুসলিম প্রাচ্যে কখনো ঘটেনি, ভবিষ্যতেও কখনো তা ঘটবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, ইসলামকে বর্জন করতে তাঁরা যখন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান অথবা যখন তাঁরা ঘোষণা করেন যে, সমাজ ও জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইসলামের কোন বক্তব্য নেই, তখন তারা তাদের গুরুদের কাছ থেকে ধার করা বুলিই কপচিয়ে যান মাত্র।

ইউরোপ ধর্ম ও বিজ্ঞানের এক সংঘর্ষ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কারণ গির্জা (গ্রীস থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত) কতকগুলো গোঁড়া ও অন্ধ বিশ্বাস গায়ের জোরে আঁকড়ে ধরেছিল এবং সেগুলো বেদবাক্য বলে ধরে নিতে জিদ ধরছিল। তাই বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়ার ফলে যখন ঐ সব থিয়োরীর ভ্রান্তি ও অযৌক্তিকতা ধরা পড়ে গেল, তখন জনগণের বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা ও গির্জার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন ছাড়া উপায় রইল না। গির্জার প্রতি অনাস্থা জাহির করতে গিয়ে তারা এই সব গির্জার পাদ্রীদের প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধেও অনাস্থা ঘোষণা করে বসল। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে লড়াই ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করল। ইতিমধ্যে ইউরোপে গির্জা নিজের উপরে ঐশ্বরিক অধিকার আরোপ করে উৎপীড়নের মাধ্যমে সেই অধিকার প্রয়োগের চেষ্টা করলে জনগণের মধ্যে এইসব ধর্মনেতাদের কুপ্রভাব থেকে মুক্তির আগ্রহ স্বাভাবিক-ভাবেই তীব্রতর রূপ পরিগ্রহ করল। এমনিভাবে সেখানে জনগণের নিকট ধর্ম এমন এক ভয়াবহ দানবীয় রূপে আবির্ভূত হল, যা তাদের জীবনে এমন কি নিদ্রাতেও যেন মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। এই তথাকথিত ধর্মের উৎপীড়ন এত বেড়ে গেল যে, ইহা জনগণকে গুটি কয়েক পাদ্রীর দাসানুদাসে পরিণত করতে প্রয়াস পায় এবং ঈশ্বরের নামে রাজ্যের বস্তাপঁচা ও উদ্ভট সব মতবাদ প্রচার শুরু হয়ে যায়। পৃথিবী গোলাকার—এই মতবাদ প্রচারের অপরাধে বিজ্ঞানীদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হল। জুলুমবাজি ও বর্বরতার এমনিতর নৃশংস অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিটি সুস্থবুদ্ধি, স্বাধীনচেতা ও বিবেকবান মানুষ এই ঘৃণ্য দানবটিকে ধ্বংস অথবা অন্ততঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ করার কাজে সহায়তা করা নিজেদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করলেন—করলেন যাতে করে ভবিষ্যতে আর কখনো এই অশুভ শক্তি মানুষের উপর জুলুমবাজি করতে সাহস না পায় এবং ধর্মের নাম কলংকিত করে এটা প্রমাণ করতে না পারে যে, ধর্ম বলতে শুধু ঝগড়া ও মিথ্যারই বেসাতি বোঝায়।

কিন্তু আমরা যারা ইসলামী প্রাচ্যে বাস করি, তাদের অবস্থা কি? আমরা কেন ধর্ম থেকে বিজ্ঞানকে পৃথক করতে যাব অথবা মনে করব যে, এ দুইয়ের পারস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব রয়েছে? বিজ্ঞানের কি এমন একটিও তথ্য আছে যা ইসলাম ও তার মর্মবাণীর বিরুদ্ধে? ইসলামী রাষ্ট্রে কখনো কি বৈজ্ঞানিকদের প্রতি নিপীড়ন করা হয়েছে? ইসলামের সমগ্র ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। এ ইতিহাস আমাদের বলে দেবে, মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় চিকিৎসাবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিজ্ঞানী

জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁদের মতামতের জন্য তাঁদের উপর কোন অত্যাচার করা হয়নি। এই সব খ্যাতনামা মুসলিম বিজ্ঞানী তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধ আছে বলে কখনো মনে করতেন না। শাসকবর্গের সাথে তাঁদের কখনো এমন কোন বিরোধ চলে নি যার ফলে তাদের যন্ত্রণা দেওয়া বা জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রশ্ন উঠতে পারতো।

তবে কেন এই সব "শিক্ষিত" লোকেরা বিজ্ঞান থেকে ধর্ম পৃথক করতে ওকালতি করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে কিছুই না বুঝে ও না জেনে আদাপানি খেয়ে এর নিন্দা করতে লেগে যান? তাদের এসব অবুঝ প্রলাপোক্তি সাম্রাজ্যবাদ শক্তির প্রবর্তিত শিক্ষার স্বাভাবিক বিষক্রিয়া বৈ নয়—অবশ্য তারা এ সম্পর্কে সচেতন নয়।

# ধর্ম কি জনগণের আফিম?

ধর্ম কি জনগণের আফিম? কার্ল মার্কস তা-ই বলেন। মুসলিম বিশ্বের কম্যুনিস্ট প্রচারবিদগণ বিশ্বস্ততার সাথে যে শুধু এই থিয়োরী প্রচার করে বেড়ান তাই নয়, তারা ইসলাম সম্পর্কেও এরকম এলজাম দিতে চেষ্টা করেন।

একথা বলা চলে যে, কার্ল মার্কস ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট পুরোধাদের আসলে ইউরোপে যে বিশেষ অবস্থা বিরাজ করছিল তাতে ধর্ম ও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার অন্তত কিছুটা যুক্তি ছিল। সে সময়ে ইউরোপে এবং বিশেষ করে রাশিয়ায় সামন্তবাদে এক দানবীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল;—সেখানে তখন হাজার হাজার অনাহারে মৃত্যুবরণ করত এবং লক্ষ লক্ষ লোক যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগে প্রাণত্যাগ করত; আবার শীতকালে ঠাণ্ডার দরুনও মারা যেত লক্ষ লক্ষ লোক। আর সামন্ত প্রভুরা মেহনতী মানুষের রক্তে হোলি খেলে ভোগ বিলাসে মত্ত উদ্দাম জীবন-যাপন করত।

মেহনতী মানুষ যখনই মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার চিন্তা করত অথবা তাদের প্রতি কি রকম অবিচার করা হচ্ছে তা ভাবতে চাইত, পাদ্রীরা সাত তাড়াতাড়ি বলত: "কেউ তোমাকে এক গালে চড় মারলে তাকে আর এক গাল এগিয়ে দেওয়া তোমার কর্তব্য। কেউ তোমার একখানা কাপড় নিয়ে গেলে তোমার বাকী পোশাক-আশাক তাকে দিয়ে দাও।"

পাদ্রীরা জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে রাখার চেষ্টা পেত এবং বিপ্লবের পথ থেকে তাদের সরিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে এমন এক চিরস্থায়ী স্বর্গের লোভ দেখাতো যেখানে—এ দুনিয়ার যারা মুখ বুজে অবিচার-অত্যাচার সয়ে যাবে—তারা অনন্তকাল ধরে সুখ ও আনন্দের সাগরে হাবুডুবু খাবে।

পাদ্রীদের প্রলোভনে কাজ না হলে শুরু হত ভয় দেখান। বলা হত, যারা সামন্ত প্রভুকে অমান্য করে তারা ভগবানকে, ধর্ম ও ধর্মযাজককেই অমান্য করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সে সময় চার্চই ছিল বৃহত্তম সামন্ত প্রভু, কারণ তার অধীনস্থ তালুকে অসংখ্য ভূমিদাস কাজ করত। সুতরাং স্বাভাবিক-ভাবেই চার্চ জার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দলে যোগ দিয়ে মেহনতী মানুষের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল। তারা সকলেই একই দলভুক্ত ছিল এবং একথা তাদের বিলক্ষণ জানা ছিল যে, যদি বিপ্লব সংঘটিত হয় তবে সামন্ত বা পাদ্রী কোন রক্তশোষকই রেহাই পাবে না।

প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন কোনটাই যখন কাজে আসত না, তখন ভগবান ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অজুহাতে তাদের উপর বল প্রয়োগ করা এবং নির্যাতন চালান হত। এ কারণেই সেখানে ধর্মকে জনগণের আসল দুশমন মনে করা হত। কার্ল মার্কসের মতে এজন্যেই "ধর্ম জনগণের আফিম।"

মুসলিম প্রাচ্যের কম্যুনিস্টরা পেশাদার মোল্লাদের উল্লেখ করে তারা কিভাবে শাসক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে মেহনতী জনগণকে বেহেশতের প্রলোভন দেখিয়ে অবিচার-অত্যাচার সহ্য করে যেতে প্রলুব্ধ করে তা দেখিয়ে দেয়। কারণ এই সব প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীরা মজদুরদের অনুভূতি বিভ্রান্ত করে যাতে করে ইতর রক্ত শোষকরা নিজেদের বিলাস-ব্যসনে নিরাপদে মত্ত থাকতে পারে।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ব্যক্তি যারা রাজার হস্ত চুম্বন করে শাসকদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পাক কুরআনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে শাসকদের প্রভাব কায়েম রাখার উদ্দেশে ইসলামের আদর্শ ও মূল নীতিকে মিথ্যা প্রমাণ করত, তাদের কথাও কম্যুনিস্টরা উল্লেখ করে থাকেন। ঐ সব ব্যক্তি মেহনতী মানুষদের বিদ্রোহ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে তাদের এই বলে ভয় দেখাত যে, শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অর্থ আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করা।

এসবই হয়ত সত্য; কিন্তু এই সমস্ত পেশাদার ধর্ম ব্যবসায়ী কি আল্লাহ্‌র বিধান ও ইসলামের নীতি অনুসারে ঐসব কাজ করেছেন? না তারা তাদের ব্যক্তিগত ও সংকীর্ণ স্বার্থে এগুলো করেছেন?

সত্য ব্যাপার এই যে, এই ধর্ম ব্যবসায়ী আল্লাহ্‌র বাণী ও ইসলামের আদর্শ বিরোধী কাজ করেছেন। এদের সাথে তুলনা করা চলে আজকের সেই সব অধার্মিক কবি, লেখক ও সাংবাদিকদের যারা তাদের সংকীর্ণ, তুচ্ছ ব্যক্তিস্বার্থের খাতিরে মিথ্যার পঙ্কে নেমে যেতে রাযী আছেন। কিন্তু ঐ সব অধার্মিক কবি, লেখক ও সাংবাদিকদের তুলনায় এই সব ধর্ম ব্যবসায়ীর অপরাধ অনেক বড় ও জঘন্য এজন্য যে, ধর্মজ্ঞ লোকেরা আল্লাহ্‌র আদর্শকে রক্ষা করবেন এবং অন্যের চেয়ে ধর্মের মর্মকথা বেশী ভাল জানবেন বলে আশা করা যায়। তারা যখন তুচ্ছ স্বার্থের কারণে আল্লাহ্‌র কালামকে মিথ্যা প্রমাণ করতে প্রয়াসী তখন তাদের মনোভাব কিরূপ হয় তা অনুধাবন করা তাদের উচিত।

এই পর্যায়ে আমরা অবশ্য একটা কথা বলে নিতে চাই যে, ইসলামে 'ধর্মযাজক' বলে কোন পৃথক শ্রেণী নেই, সুতরাং তারা যা বলে তাকেই ইসলাম বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। মুসলিম জনগণের দুর্ভাগ্যের মূল কারণই হচ্ছে নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের বিপুল অজ্ঞতা।

ইসলাম জুলুমের বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের বিদ্রোহকে পছন্দ করে না বলে যে অভিযোগ করা হয় তা যে কত মিথ্যা তা একটা ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। মিসরের প্রাক্তন বাদশাহ ফারুককে বিতাড়িত করার জন্য যে আন্দোলন-উদ্যোগ গ্রহণ করে তা ছিল একান্তই একটি ধর্মীয় আন্দোলন।

একথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলিম প্রাচ্যের সবকটি মুক্তি আন্দোলনই ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফরাসী জবরদখলের বিরুদ্ধে মিসরের প্রতিরোধ সংগ্রামে উলামাগণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মুহম্মদ আলীর জুলুমবাজির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবক্তাও ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা ওমর মাকরাম। সুদানে বৃটিশ জবরদখলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেও নেতৃত্ব দেন আর একজন ধর্মীয় নেতা আল-মাহদী। ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে লিবিয়ার এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে মরক্কোর বিদ্রোহ, এমন কি বৃটিশ দখলের বিরুদ্ধে কাশানীর বিপ্লব—এর সবটাই ছিল ইসলামের প্রেরণায় ও নামে পরিচালিত অভিযান। মুসলিম প্রাচ্যের সবকটি বিপ্লবই প্রমাণ করে যে, ইসলাম সর্বপ্রকার অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি বিরাট শক্তিশালী শক্তি।

কম্যুনিস্টরা প্রায়ই কুরআন শরীফের কতিপয় আয়াতের উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, ইসলাম ধৈর্য অবলম্বন করে অবিচার ও অত্যাচার সয়ে যেতে বিধান দেয়। তারা এই আয়াতটির উল্লেখ করে:

> আল্লাহ্ যেসব বিষয়ে তোমাদের কতককে অন্যদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে লোভ করো না। (৪ : ৩২)

এ আয়াতটির উল্লেখও তারা করে:

> তাদের কাউকে কাউকে ভোগের জন্য যে সব বস্তু দিয়েছি এবং তাদের পরীক্ষার জন্য যেসব পার্থিব সামগ্রী দিয়েছি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে তোমাদের চোখকে কষ্ট দিও না। তোমার প্রতি-পালকের দান অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী। (২০ : ১৩১)

কুরআনের তফসীরকারগণ বলেন যে, পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল হয় যখন একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করেছিল যে, মেয়েদের বাদ দিয়ে শুধু পুরুষদের জন্য

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কেন? অপর একটি এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুসারে এই আয়াতে বাস্তব প্রচেষ্টা-বর্জিত ফাঁকা প্রত্যাশাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের প্রত্যাশা মানুষকে হিংসাতুর করে তোলে, আর তাতে যে মনমরা মনোভাব সৃষ্টি হয় তাতে তার কোনই বৈষয়িক কল্যাণ হয় না। বাস্তব প্রচেষ্টা বিবর্জিত আকাঙ্ক্ষার হাওয়াই ফানুস ওড়ানোর পরিবর্তে এই আয়াতে মানুষকে এমন সব কাজ করতে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যেগুলো প্রকৃতপক্ষেই উত্তম ও সম্মানজনক।

দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে নিছক বৈষয়িক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে এবং শুধুমাত্র পার্থিব সমৃদ্ধির কারণে কাউকে বড় মনে না করতে আহ্বান জানান হয়েছে। যে সমস্ত অবিশ্বাসী প্রচুর ধনৈশ্বর্যের মালিক তাদের তুচ্ছতা প্রমাণের উদ্দেশ্য নবী-রসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করেই আয়াত নাযিল হয়েছিল বলে মনে করা হয়। যে কোন নবী বা রসূল এসব লোক থেকে শ্রেষ্ঠতর, কারণ তিনি ন্যায় ও সত্যের পথে রয়েছেন।

এসব সত্ত্বেও তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নেওয়া গেল যে, এসব আয়াতে আমাদের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে এবং অন্যের সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত না করতে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ ধরনের অনুজ্ঞা কখন কার্যকর করা হবে? কখন এটা মানতে হবে?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামকে হয় গ্রহণ করে পুরাপুরি রূপায়িত করতে হবে নইলে পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। একটি জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে একে যখন পুরোপুরি মানা যায় এবং এর সমস্ত দাবী ও বিধান যখন কার্যকর করা, যায় শুধুমাত্র তখনই এর সুফল পাওয়া যেতে পারে। এই যে দরিদ্র ও বঞ্চিতকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং ধনীদের সম্পদের প্রত্যাশা না করতে বলা—এটা চিত্রের একদিক মাত্র। চিত্রের অপরদিকে দেখা যায়—ধনীদের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্‌র পথে দান করতে আহ্বান জানান হয়েছে। তাদের ভয় দেখান হয়েছে যে তারা যদি এ জগতে ঘৃণ্য আত্মসর্বস্বতার গোলামী করে তবে পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। যদি আমরা এই দৃষ্টিতে প্রশ্নটি বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যাবে বিচারের নিক্তি নিখুঁত ভারসাম্যের মধ্যেই রয়েছে।

একদিকে নিঃস্বার্থভাবে ধনসম্পদ দান করতে আহ্বান জানান হয়েছে, অপরদিকে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার অবমাননা থেকে মনকে পবিত্র রাখতে আহ্বান জানান হয়েছে। এভাবেই ইসলাম অর্থনৈতিক ইনসাফের সাথে সঙ্গতি

রক্ষা করে সমাজকে আত্মিক শান্তিতে জীবন ধারণ করবার সুযোগ দান করে। আর ইসলামের এই অর্থনৈতিক ইনসাফ দাবী করে যে, অর্থসম্পদ সুষমভাবে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে বন্টন করতে হবে। কেউ বিলাসিতায় গা ঢেলে দেবে, আর অন্যেরা বঞ্চিত থাকবে—তা হবে না। কোন সমাজে যখন ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকর করা হয় সেখান অনৈসলামী সমাজব্যবস্থার বেইনসাফী বা অর্থনৈতিক বঞ্চনা কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু যেখানে ধনীরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং জনস্বার্থে অর্থসম্পদ ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করে না, সেখানে দরিদ্র ও বঞ্চিতকে কে এই বঞ্চনা সহ্য করে যেতে আবেদন জানাবে? ইসলাম নিশ্চয়ই নয়।

যারা অত্যাচার সহ্য করে যায় এবং তার প্রতিরোধের প্রচেষ্টা না চালায় তাদের সকলকে বরং ইসলাম ইহজগত ও পরজগত উভয় জগতে চরম দুর্ভাগ্যের ভয় দেখিয়েছে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

> যারা নিজেদের উপর অত্যাচার সহ্য করেছে তাদের মৃত্যুর সময় জান কবজ করতে গিয়ে ফেরেশতাগণ বলেন: 'তোমরা কোথায় ছিলে?' তারা আরও বলেন: 'অত্যাচার থেকে দূরে সরে যাবার মত যথেষ্ট প্রশস্ত দুনিয়া কি তোমাদের জন্য ছিল না?' এইসব লোকদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম—কতই না খারাপ সে আবাসস্থল। তবে যারা প্রকৃতই দুর্বল ও অত্যাচারিত নর-নারী, শিশু—যাদের পথ চলার কোন ক্ষমতা বা সাধ্য নেই তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের আল্লাহ্ মাফ করতে পারেন। আল্লাহ্ বারবার পাপ মোচন ও ক্ষমা করে থাকেন। (৪:৯৭—৯৯)

কেউ দুর্বল বা মজলুম—এই অজুহাতে অন্যায়ের নিকট আত্মসমর্পণ অমার্জনীয় অপরাধ। নিজের উপর অত্যাচারকারী কথার দ্বারা কুরআন সেইসব লোককে বোঝাতে চেয়েছে যারা আল্লাহ্‌প্রদত্ত মানবিক মর্যাদার চাইতে নিম্নতর অবস্থাতে রাযী থাকে এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় না।

যে সমস্ত স্থানে ইসলামের উপর অত্যাচার চালান হচ্ছিল সেখান থেকে হিজরত করার আহ্বান মাত্র একটি বিশেষ সময়েই জানান হয়েছিল। কারণ জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আরও বহু পথ রয়েছে। আমরা এখানে যে বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই সেটা হচ্ছে: ইসলাম চোখ বুজে অত্যাচার সহ্য করা অত্যন্ত মারাত্মক অন্যায় মনে করে। এমন কি যারা প্রকৃতপক্ষেই অত্যন্ত দুর্বল ও অত্যাচারিত এবং যাদের কিছু করবার ক্ষমতা বা সাধ্য নেই, তাদের অজুহাত সুস্পষ্ট ও তাদের দুর্বলতা বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তাদের ক্ষমা করা হবে এমন কোন

সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি, ক্ষমা পাবার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে মাত্র। এসব দুর্বল ও মজলুম লোককে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না—এমন কথা এই আয়াতে বলা হয় নি—কারণ আল্লাহ্ ত তাঁর সৃষ্টির প্রতি অবিচার করবেন না—তবে এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, যার সামান্যতম শক্তি রয়েছে তারও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে পিছপা হওয়া উচিত নয়।

যেসব লোক প্রকৃতপক্ষেই দুর্বল ও অত্যাচারিত তাদেরকেও অসহায় ফেলে রাখা হবে না। তাদের জন্য সংগ্রাম করা এবং অত্যাচার থেকে তাদের মুক্ত করা ইসলাম বিশ্বাসীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব:

> আল্লাহ্র পথে নিপীড়িতদের জন্য তোমরা কেন সংগ্রাম করবে না? দুর্বল, অত্যাচারিত নর-নারী ও শিশুরা আর্তক্রন্দন করছে: প্রভু হে, জালিমদের এই দেশ থেকে আমাদের তুমি উদ্ধার কর। (৪ : ৭৫)

যারা স্বেচ্ছায় অত্যাচার সহ্য করে যায় এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ্ কোনদিনই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মজলুমকে মুক্ত করলে তবেই আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এই সব আয়াত শুধুমাত্র অবিশ্বাসীদের মধ্যে অবস্থানকারী সেই সব মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার জন্য এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য যাদের উপর অত্যাচার করা হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন এবং ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবন উন্নয়নের মধ্যে ইসলাম কোনরূপ পার্থক্য করে না। যারা ইসলামের অনুষ্ঠানাদি পালন ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রদান করে তারা নামে ও আচরণে অমুসলমান, না নামে মুসলমান, আচরণে অমুসলমান--তাতে কিছু যায় আসে না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

> যারা আল্লাহ্র বিধান অনুসারে সমাজ পরিচালনা করে না, তারা অবিশ্বাসী। (৫ : ৪৪)

ইসলামের বিধান এই যে, ধনসম্পদ কিছুতেই গুটিকতক ধনীদের মধ্যে আবর্তিত হতে দেওয়া চলে না। ইহা আরও বিধান দেয় যে, রাষ্ট্র যে কোন উপায়ে তার সমস্ত নাগরিকের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করবে--তা সে উপযুক্ত কাজের সংস্থান করেই হোক বা কেউ কর্মে অক্ষম হলে তাকে সরকারী কোষাগার থেকে বৃত্তি দিয়েই হোক।

তাছাড়া ইসলামের রসুল (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে সরকারী কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য যেসব অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে সেগুলো বেসরকারী ও অন্যান্য পর্যায়ের কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। এর সবগুলিই ইসলামী জীবন-বিধানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং কেউ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দুনিয়ার বুকে বাস্তবায়নের চেষ্টা না করলে তাকে প্রকৃত অর্থে মুসলমান বলা যায় না। যারা স্বেচ্ছায় অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করে যায় এবং যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহ তাদের প্রতিও প্রযোজ্য, যারা ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান কার্যকর করতে সংগ্রাম করে না।

"আল্লাহ্ যে সমস্ত বস্তু তোমাদের কারো কারো মধ্যে অকৃপণ ভাবে বিতরণ করেছেন, সেগুলোর দিকে লোভ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়",—অথবা—"কারো কারো ভোগের জন্য যা দিয়েছি তার জন্য তোমাদের চোখকে পীড়িত করো না"—ইত্যাদি আয়াতের ভুল অর্থ করে জনগণ যদি সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ পরিহার করে চলে, তাহলে তার পরিণতি কি দাঁড়াবে?

ধনসম্পদ একটি শ্রেণীর গুটিকতক লোকের হাতে জমা হয়ে যাবে এবং জনসাধারণের অধিকাংশকে বঞ্চিত রেখে তা তাদের হাতেই আবর্তিত হতে থাকবে (ঠিক যেমনটি সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের অধীনে হয়ে থাকে)। কিন্তু এটা ত হবে মারাত্মক অন্যায়; কারণ এতে সম্পদ ধনীদের হাতে সীমাবদ্ধ করা সম্পর্কে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার খেলাফ হবে। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে এভাবে বিরত থাকার আরেকটি পরিণতি এই হবে যে, সম্পদশালী ব্যক্তিরা হয় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে, নইলে তারা স্বার্থপরভাবে এটা খরচ করবে এবং আরাম-আয়াসে ও বিলাসিতায় গা ঢেলে দেবে। প্রথমোক্ত অবস্থা নিন্দনীয়: "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য মজুদ করে রেখে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে না তাদের কঠোরতম শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (কুরআন শরীফ—৯:৩৪)। শেষোক্ত অবস্থা সম্পর্কেও বলা চলে, কুরআন বিলাসিতাকে সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ করে এবং যারা বিলাসিতায় গা এলিয়ে দেয় কুরআন তাদের অধার্মিক অবিশ্বাসীরূপে অভিহিত করে:

> আমরা যখনই কোন জনপদে বাণীবাহক প্রেরণ করেছি, এর ধনাঢ্য বিলাসী বাসিন্দারা ঘোষণা করেছে: দেখ, তোমাদের আনীত আদর্শে আমরা বিশ্বাসী নই। (৩৪:৩৩)

যখন কোন কওমকে আমরা ধ্বংস করতে চাই, তখন তাদের মধ্যে যাদেরকে আমরা জীবন সামগ্রী প্রচুর পরিমাণ দিয়েছি অথচ তারা সুপথ খেলাফ করে

আমরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রেরণ করি : এর ফলে তাদের অন্যায় বাস্তবে প্রমাণিত হয়ে যায়। এর পরই আমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলি। ( ১৭ : ১৬ )

এবং যারা বাম হস্তের অধিকারী—যারা বাম হস্তের অধিকারী তাদের অবস্থা কী হবে? তাদের অবস্থান হবে উত্তপ্ত বায়ু ও গলিত উত্তপ্ত পানির মধ্যে এবং এমন কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রকুণ্ডলীর মধ্যে যা মোটেই ঠাণ্ডা বা আরামদায়ক নয়। মনে রেখ, এর কারণ এই যে, দুনিয়ায় তারা বিলাসিতার জীবন-যাপন করত। ( ৫৬ : ৪১ )

সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা থেকে জনগণ বিরত থাকলে তার পরিণতি খারাপ হতে বাধ্য। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্যায়কে চোখ বুজে মেনে নিতে ইসলাম আহ্বান জানাতে পারে—এ ধরনের অপবাদ ইসলাম সম্পর্কে কী করে দেওয়া যেতে পারে? আল্লাহ্‌ তো নিজেই বলেছেন :

বনি ইসরাইলদের মধ্যে যারা দাউদ ও মরিয়ম-নন্দন ঈসার আনীত বাণী অস্বীকার করেছিল তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছিল। কারণ তারা আল্লাহ্‌-দ্রোহিতা করেছিল এবং একটানা অনাচারে লিপ্ত ছিল। তারা যেসব অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত হত সে সম্বন্ধে পরস্পরকে বাধা দিত না : তারা যা করত তা ছিল রীতিমত অন্যায় অবিচার। (৫ : ৮১-৮২)

অন্যায়-অবিচার স্বীকার করে নেওয়া ও সহ্য করে যাওয়াকে আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসের লক্ষণ বলে মনে করেন এবং এর ফলে আল্লাহ্‌র ক্রোধ, অভিসম্পাৎ ও গজব নেমে আসে।

রসূল (সা) বলেন, "যে কেউ কোন অন্যায় দেখে, তার উচিত নিজের হাতে তা প্রতিরোধ করা।" তিনি আরও বলেন, "অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।"

শাসক অসৎ না হলে সমাজে উপরোল্লিখিত অনাচার ছড়াতে পারে না এবং তা শাসকের নিকট গ্রহণযোগ্যও হতে পারে না। আর শাসক যদি অসৎই হয় তবে তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে প্রতিরোধ সংগ্রাম করা পবিত্র কর্তব্য।

ইসলাম জনগণকে অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বা শোষণ-বঞ্চনা মেনে নিতে আহ্বান জানায়—এ ধরনের অভিযোগ কোন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি করতে পারে না। যারা এ বিষয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথবা তাদের প্রবৃত্তির গোলামী করে একমাত্র তারা ছাড়া আর কেউই এ ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে কার্যকরী প্রচেষ্টা-বর্জিত অলস আকাঙ্ক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে সমস্ত পরিস্থিতিকে পৃথিবীর কেউ পরিবর্তন করতে পারে না—রাষ্ট্র, সমাজ বা জনগোষ্ঠী—এগুলোকে স্বীকার করে নিতেও এতে আহ্বান জানান হয়। এগুলো স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়।

অনেক লোক আছে, যাদের যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতিভা আছে। অন্যেরাও হয়ত সেই যশ কামনা করে অথচ এগুলো অর্জনের প্রয়োজনীয় প্রতিভা তাদের নেই। এই সব অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রাষ্ট্র কী করতে পারে? অলস বিদ্বেষ হতে তাদের মুক্ত করবার জন্য রাষ্ট্র কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে? রাষ্ট্র কি এসব লোকদের জন্য প্রতিভা 'উৎপাদন' করবে, না তা করা সম্ভব?

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনে করা যাক, একটি সুন্দরী রমণী অন্যদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অন্য একটি মেয়েলোকের মধ্যে সেই সৌন্দর্য বা কমনীয়তা না থাকার দরুন সে মানুষের দৃষ্টি বা প্রশংসা আকর্ষণ করতে পারে না—অথচ তার ইচ্ছা, লোকে তাকে খুব সুন্দরী মনে করুক। এক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে রাষ্ট্র কী করতে পারে? অথবা মনে করা যাক, একটি সুখী দম্পতি—যারা সন্তান কামনা করে এবং সন্তান পেয়ে তারা আরও খুশী—আরেকটি দম্পতি যারা প্রেমময় জীবন থেকে বঞ্চিত, তদুপরি নানা রকম চিকিৎসা সত্ত্বেও সন্তান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এখন পার্থিব সবটুকু শক্তি ব্যয় করেও দ্বিতীয় দম্পতির অভাব কী করে পূরণ করা সম্ভব?

জীবনে এমনি ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অর্থনৈতিক সমাধান বা সামাজিক সুবিচারের পথে এসব সমস্যার কোন সমাধান নেই। এসব ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান হচ্ছে আল্লাহ্র দানকে সন্তুষ্টির সাথে মেনে নেওয়া। এই দান শুধু মাত্র পার্থিব দেনা-পাওনার হিসাবে দেওয়া হয়নি এবং এ ধরনের পার্থিব বঞ্চনার বদলাতে পরজীবনে শান্তির আশা থাকে।

এমন কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও কে বলতে পারে যে, এই পৃথিবীতে পরিপূর্ণ সাম্য অর্জন করা সম্ভব? পৃথিবীতে এমন একটি দেশও আছে কি, যেখানে সমস্ত বেতন ও সমস্ত পদ সমান?

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবন-ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। সেখানে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। মনে করা যাক, সেখানকার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী শ্রমিক একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় অথচ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তার

মানসিক শক্তির সীমাবদ্ধতার দরুন এটা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। এখন তার বাসনা পূরণে রাষ্ট্র আর কী ভাবে সাহায্য করতে পারে? অনুরূপভাবে একজন শ্রমিক যার অতিরিক্ত সময়ের মজুরী নেওয়ার ইচ্ছা কিন্তু সেরূপ মজুরীর জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শ্রম দান করার দৈহিক যোগ্যতা তার নেই—অথচ সে যদি একজন সবলদেহী শ্রমিকের দৃষ্টান্ত দেখে এই কামনা পোষণ করে তবে রাষ্ট্র তাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারে? এসব লোক কী করে একটানা উদ্বেগ, হাহুতাশ এবং বিদ্বেষের জীবন টেনে চলতে পারে? এসব লোক কী করে অতিরিক্ত এবং তার থেকে বড় অংকের বেতন কামনা না করে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারে? বাইরের থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও লোভ-মোহের অভিশপ্ত পথে এই সমস্যার সমাধান খোঁজাই উত্তম, না স্বেচ্ছায় নিজের উদ্যোগে ভেতর থেকে এই সমস্যার সমাধান করা অধিক কল্যাণকর?

মোদ্দা কথা—মানুষের বৈধ কামনা-বাসনা পূরণের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাওয়া এবং যা অপরিবর্তনীয় তাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়াই ইসলামের বিধান। কিন্তু যেখানে মানুষের পক্ষে প্রতিকারযোগ্য অবিচার চলে সেখানে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একে খতম করে না দিলে আল্লাহ্ কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না:

> যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে শহীদ হয় বা বিজয়ী হয়—আমরা শীঘ্রই তাকে পুরস্কৃত করব। (৪ : ৭৪)

পৃথিবীতে যদি এমন কোন ধর্ম থাকে যাকে জনগণের আফিম বলে আখ্যায়িত করা চলে, ইসলাম নিশ্চয়ই সে ধর্ম নয়। কারণ ইসলাম সর্বপ্রকার অবিচারের বিরোধী এবং যারা অত্যাচার-অবিচার মাথা পেতে নেয় তাদের কঠোর শাস্তির বিধান দেয়।

# ইসলাম, পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি

## ইসলাম ও পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদের জন্ম মুসলিম বিশ্বে হয়নি। পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে যন্ত্র আবিষ্কারের পর—আর এটি ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছিল ইউরোপে।

মুসলিম বিশ্বে পুঁজিবাদ আমদানী করা হয় এমন একটা সময়ে, যখন ইহা ইউরোপীয় শাসনাধীনে ছিল। মুসলিম বিশ্ব যখন দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য ও পশ্চাদপদতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল—উন্নয়নের নামে তখন এখানে পুঁজিবাদের প্রসার সাধন করা হয়। এ কারণে কতক লোক মনে করে, ভাল-মন্দ নির্বিশেষে গোটা পুঁজিবাদকেই ইসলাম সমর্থন করে। তারা আরও মনে করে যে, ইসলামী আইন বা ব্যবস্থায় এমন কোন বিধান নেই যা পুঁজিবাদের বিরোধী। তারা যুক্তি দেখায়, ইসলাম যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দেয়, সুতরাং ইহা পুঁজিবাদেরও অনুমতি দেবে।

এই অভিযোগের জবাবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সুদ ও মনোপলি ছাড়া পুঁজিবাদ গড়ে উঠতে পারে না, আর পুঁজিবাদের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্বেই ইসলাম এগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

প্রশ্নটির আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। যন্ত্রের আবিষ্কার যদি মুসলিম বিশ্বে ঘটত তবে এরূপ আবিষ্কার-জনিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ইসলাম কিভাবে মুকাবেলা করত? শ্রম ও উৎপাদন সংগঠনে ইসলামী বিধান ও আইন কিভাবে প্রয়োগ করা হত?

কার্ল মার্কস প্রভৃতি ধনতন্ত্র-বিরোধী সহ প্রায় সকল অর্থনীতিবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, প্রথম দিকে মানবতার অগ্রগতি ও কল্যাণে পুঁজিবাদের যথেষ্ট অবদান ছিল। এতে উৎপাদন বেড়ে যায়, যোগাযোগ-ব্যবস্থার মান উন্নত হয় এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির হারও বেড়ে যায়। শ্রমজীবীদের জীবন-মান কৃষি-নির্ভর পর্যায়ের অবস্থা থেকে অনেক উন্নত হয়।

কিন্তু এই গৌরবজনক চিত্র বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এর কারণ স্বরূপ মনে করা হয়, পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে পুঁজিপতি মালিকদের হাতে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং শ্রমিক শ্রেণীর সম্পত্তি হ্রাস পেতে

থাকে। এর ফলে পুঁজিপতি মালিকরা কম্যুনিস্ট দৃষ্টিতে যারা প্রকৃত উৎপাদক সেই শ্রমিকদের ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হল। কিন্তু শ্রমিকদের এত কম মজুরী দেওয়া হল যে, তার দ্বারা কিছুতেই সুন্দর জীবন-যাপন সম্ভব নয়। অপরদিকে মালিকরা সমস্ত মুনাফা লুন্ঠন করে বিলাস ও দুর্নীতির স্রোতে গা ঢেলে দিল।

এছাড়া শ্রমজীবীদের মজুরী অত্যন্ত কম হওয়ার দরুন পুঁজিবাদী দেশসমূহের সমস্ত উৎপাদন ভোগ করবার শক্তি তাদের হয়ে উঠল না। এর ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সঞ্চয় জমে উঠল। তার পরিণতিতে পুঁজিবাদী দেশসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য নতুন বাজার খোঁজ করতে শুরু করল। এমনি করে উদ্ভব হল উপনিবেশবাদের এবং তার সাথে বাজার ও কাঁচামালের প্রশ্নে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা বিরামহীন দ্বন্দ্ব। এসবেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ দেখা দিল ধ্বংসকারী যুদ্ধ।

তাছাড়া ধনতন্ত্রী ব্যবস্থা মাঝে মাঝে প্রায়ই মন্দা-জনিত সংকটাবস্থার সম্মুখীন হয়। ক্রমবর্ধিষ্ণু উৎপাদনের তুলনায় আন্তর্জাতিক ভোগের পরিমাণ হ্রাসের ফলেই এই মন্দার সৃষ্টি হয়।

সমূহবাদের কোন কোন প্রচারবিদ ধনবাদী ব্যবস্থার সমস্ত সমস্যার জন্য পুঁজিপতির অন্যায় মনোভাব বা শোষণমূলক মনোবৃত্তির পরিবর্তে পুঁজির উপরই সমস্ত দোষ চাপাতে চেষ্টা করেন। এ ধরনের অযৌক্তিক ও অদ্ভুত যুক্তি শুনে মনে হয়, মানুষের অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি যতই থাকুক, সে যেন অর্থনীতির হাতে একটি অসহায় পুতুল মাত্র।

এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, ধনবাদ তার প্রথম দিকে যে সব নির্দোষ ও প্রগতিশীল কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, ইসলাম হয়ত সেগুলো অনুমোদন করত। কিন্তু শিল্প-সংগঠন এবং মালিকদের অসৎ মনোভাব বা পুঁজির মূল প্রকৃতিতে যে শোষণের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন না করে ইসলাম কিছুতেই পুঁজিবাদকে অবাধে বেড়ে উঠবার সুযোগ দিত না। এ সম্পর্কে ইসলামের নীতিতে মালিকদের সাথে শ্রমিকদেরও মুনাফার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন কোন মালিকী আইনজ্ঞ তো মালিকের সাথে শ্রমিকদের সমান মুনাফার অধিকারই স্বীকার করেছেন। মালিক সমস্ত পুঁজি সরবরাহ করে, আর শ্রমিক কাজ করে—উভয় প্রকার প্রচেষ্টাই সমান বলে তারা মুনাফারও সমান অংশের হকদার।

উপরোল্লিখিত নীতি থেকে ইনসাফ কায়েমে ইসলামের ব্যগ্রতা অনুধাবন করা যায়। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এই তাগিদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই ইসলাম রূপায়িত করেছিল। কোন অর্থনৈতিক জরুরী পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে যে এটা চাপান হয়েছিল তা নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের পরিণতিতেও এটা আসে নি—যদিও কোন কোন অর্থনৈতিক মতবাদের প্রচারকরা অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশে এই সংগ্রামকেই একমাত্র কার্যকরী নিয়ামক বলে মনে করেন।

শুরুর দিকে শিল্প বলতে বোঝায় সহজ দৈহিক শ্রম—ছোট ছোট কারখানার ক্ষুদ্র সংখ্যক শ্রমিক তা সম্পন্ন করত। উপরোল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে সেখানে শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সম্পর্ক ইনসাফের ভিত্তিতে নির্ণীত হত—যা ইউরোপে কখনও দেখা যায়নি।

অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, জাতীয় ঋণের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার ফলেই পুঁজিবাদ তার প্রাথমিক কল্যাণময়ী পর্যায় থেকে আজকের ক্ষয়িষ্ণু অকল্যাণকর স্তরে উপনীত হয়েছে। এর ফলে ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় আর এই ব্যাঙ্কই অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করে এবং সুদের বিনিময়ে অর্থ ধার দেয়। এইসব ঋণদান এবং ব্যাঙ্ক-কর্ম-সূচীর ভিত্তি হচ্ছে সুদ, যা ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

অপরপক্ষে পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কঠোর প্রতিযোগিতা, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানীর ধ্বংস সাধন করে বা নিদেনপক্ষে এগুলো একত্রিকরণের মাধ্যমে বৃহৎ কোম্পানী গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। এর ফলে গড়ে ওঠে মনোপলি। এই মনোপলিও ইসলামে নিষিদ্ধ। রসূল (সা)-এর বেশ কয়েকটি হাদীসেই এর প্রমাণ মিলে। রসূল (সা) বলেছেন: "একচেটিয়া কারবারী জালিম।" ইসলাম যেহেতু গোড়াতেই সুদ ও মনোপলি নিষিদ্ধ করেছে—সুতরাং শোষণ, উপনিবেশবাদ ও যুদ্ধের প্রতীক পুঁজিবাদ ইসলামের আওতাধীনে কিছুতেই তার বর্তমান অশুভ পর্যায়ে বেড়ে উঠবার অবকাশ পেত না।

ইসলামী শাসনাধীনে শিল্পের উদ্ভব ঘটলে তার পরিণতি কি হত?

ইসলাম নিশ্চয়ই মালিক-শ্রমিকের মুনাফায় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজনে শিল্পকে ক্ষুদ্র কারখানার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখত না। উৎপাদন বৃদ্ধি করা হত; তবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তার থেকে পৃথক ধরনের সম্পর্ক এখানে গড়ে তোলা হত। কারণ মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মুনাফার সম-বন্টনের যে নীতি উপরে উল্লিখিত

হয়েছে ইসলামের সে ধরনের কোন মূলনীতির ভিত্তিতেই সেই সম্পর্ক গড়ে উঠত।

এতে করে ইসলাম সুদ ও মনোপলির আশ্রয় গ্রহণ পরিহার করত এবং ধনতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকরা যে ধরনের নির্যাতন ও শোষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও অবমাননা সহ্য করতে বাধ্য হয় তাও ইসলাম বর্জন করতে পারত।

এটা কল্পনা করা আহাম্মকী হবে যে, কঠোর পরীক্ষা, শ্রেণীসংঘর্ষ ও অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যম ছাড়া ইসলাম এ ধরনের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারত না এবং এসব করতে গিয়ে তার বিধান সংশোধনের প্রয়োজন হত। এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও প্রাথমিক পর্যায়ের পুঁজিবাদের সমস্যাবলীর মুকাবিলায় ইসলাম অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অগ্রণী ছিল। এ কাজে ইসলাম বাইরের চাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। বরং এ কাজ ইসলাম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই এর নিজস্ব চিরন্তন ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতেই করেছে, যদিও এ ব্যাপারে কম্যুনিস্ট লেখকরা চিরকাল বিদ্রূপ করে আসছে। অপরদিকে ইহা বাস্তব সত্য যে, অন্যতম আদর্শ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়া সামন্তবাদের স্তর থেকে পুঁজিবাদের মধ্যবর্তী পর্যায়ের মধ্যে না গিয়েই কম্যুনিজমে পৌঁছেছে। এমনিভাবে রাশিয়া কার্ল মার্কসের আদর্শ গ্রহণ করে বিকাশের স্তর সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বকেই মিথ্যা প্রমাণ করেছে। অথচ মার্কসের মতে প্রতিটি রাষ্ট্রই এসব স্তর পেরোতে বাধ্য।

উপনিবেশবাদ, যুদ্ধ ও জনগণের শোষণ সম্পর্কে একথা বলা চলে যে, ইসলাম এগুলো এবং ধনবাদের সৃষ্ট অন্যান্য সব অভিশাপেরই ঘোরতর বিরোধী। অন্যান্য জাতিকে ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা অথবা শোষণের উদ্দেশ্যে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইসলামের নীতি নয়। আক্রমণের মুকাবিলায় অথবা এমন পরিস্থিতিতে যখন শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর বাণী প্রচারের পথ জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, শুধু তখনই ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়।

কম্যুনিস্ট ও তাদের অনুসারীদের ধারণা—মানব-সমাজের বিকাশে উপনিবেশবাদ একটি অপরিহার্য স্তর। তারা আরো বলেন, কোন তত্ত্ব বা নৈতিক আদর্শের দ্বারাই উপনিবেশবাদ ঠেকান সম্ভব ছিল না; কারণ এটি একটি অর্থনৈতিক ঘটনা, যার উৎপত্তি শিল্পায়িত দেশের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও এসব উদ্বৃত্ত পণ্যের জন্যে বিদেশী বাজারের প্রয়োজন থেকে।

এ-কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, উপনিবেশবাদের অনিবার্যতা সম্পর্কে এ ধরনের কোন বস্তাপচা তত্ত্বে ইসলাম বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া কম্যুনিস্টরা নিজেরা বলে

ও প্রচার করে বেড়ায় যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্ম-সময় ও শ্রমিকদের ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ করে রাশিয়া উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমস্যার সমাধান করবে। কম্যুনিজম যে সমাধান পেয়েছে বলে প্রচার করে তা অন্যান্য ব্যবস্থায়ও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উপনিবেশবাদ একটি সুপ্রাচীন মানবীয় প্রবৃত্তি বিশেষ। ধনবাদের সাথে এর জন্ম হয়নি; যদিও ধনতন্ত্রের আধুনিক মারণাস্ত্র একে অধিকতর হিংস্র করে তুলেছে। পরাজিত দেশকে শোষণের ব্যাপারে রোমান উপনিবেশবাদীরা আধুনিক উপনিবেশবাদীদের চাইতেও অনেক বেশী হিংস্র ও বর্বর ছিল।

ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষ্য এই যে, যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্য সমস্ত মতবাদের তুলনায় ইসলামী বিধানে সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন মনোভঙ্গী রয়েছে। শোষণ এবং জবরদস্তিমূলক পথে অপরের আযাদী হরণের উদ্দেশ্যে ইসলামী যুদ্ধ সংঘটিত হয় না। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে শিল্প বিপ্লব ঘটলে যুদ্ধ বা উপনিবেশবাদের সাহায্য ছাড়াই ইসলাম উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে পারত। তাছাড়া এ কথাও বলা যেতে পারে যে, বাড়তি উৎপাদনের সমস্যা বর্তমান পর্যায়ের ধনবাদী ব্যবস্থারই একটা প্রতিফলন মাত্র। অন্য কথায় ধনতন্ত্রের মূল ভিত্তিই যদি উৎপাটিত করা যায় তবে এ-সমস্যাই থাকবে না।

অপরদিকে দেখা যায়, অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য ও বঞ্চনার যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হবে আর সম্পদ গুটিকতক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হবে-ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এটা বরদাস্ত করতে পারেন না। কারণ সম্পদের এই পুঁজিকরণ ইসলামী নীতির খেলাপ। জনগণের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে, যাতে সম্পদ কিছুতেই ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে না পড়ে। ইসলাম রাষ্ট্রনায়ককে ইসলামী আইন কার্যকরী করতে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবার দায়িত্ব দেয়—যাতে কোন নাগরিক বে-ইনসাফী ও অন্যায়ের শিকার না হয়। সম্পদ পুঁজিকরণ ব্যাহত করবার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র আইনের আওতাধীনে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়। আমরা এ-প্রসঙ্গে উত্তরাধিকার-আইনের উল্লেখও করতে পারি; কারণ এই আইন প্রতিটি ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সুষম বন্টনের ব্যবস্থা দেয়। যাকাতের উল্লেখও এখানে করা যেতে পারে; কারণ এর মাধ্যমে মূলধন ও মুনাফার শতকরা আড়াই ভাগ দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়াও ইসলাম সম্পদ মজুতকরণ নিষিদ্ধ করেছে। অনুরূপভাবে ইহা সুদও নিষিদ্ধ করেছে। এই সুদই পুঁজি

সৃষ্টির মূল ভিত্তি। ইসলামী সমাজের নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক পারস্পরিক দায়িত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, শোষণের উপর নয়।

রসূলে করীম (সা) জীবন-ধারণের বুনিয়াদী প্রয়োজনসমূহ সহ কতিপয় অধিকার কর্মচারীদের জন্যে সুনিশ্চিত করেন: "কোন লোককে আমাদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) কোন দায়িত্ব দেওয়া হলে তার যদি স্ত্রী না থাকে তার স্ত্রীর ব্যবস্থা করা হবে; তার যদি গৃহ না থাকে তার গৃহের ব্যবস্থা করা হবে, তার যদি চাকর না থাকে তার চাকর দেওয়া হবে, তার যদি গৃহপালিত জন্তু না থাকে তার জন্তুর ব্যবস্থা করা হবে।"

এই গ্যারান্টি শুধু রাষ্ট্রের কর্মচারীদের জন্য নয় —প্রতিটি নাগরিকের জন্যই এগুলো মৌলিক প্রয়োজন। রাষ্ট্রের যে-কোন চাকুরীর বিনিময়ে এই মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা যেতে পারে। যারা এ কাজ না করে সমাজের কল্যাণকর অপর কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত থাকবেন তারা তার মারফতে এই প্রয়োজন পূরণের সুযোগ লাভ করবেন। রাষ্ট্র যদি তার কর্মচারীদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দান করে, রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রমরত প্রতিটি নাগরিকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। যারা বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অল্প বয়সের কারণে কাজ করতে অক্ষম তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বায়তুলমাল গ্রহণ করে—এ থেকেই আমরা উপরোক্ত নীতির সত্যতা অনুধাবন করতে পারি। যাদের সম্পদ তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের জীবিকার পূর্ণ দায়িত্বও বায়তুলমাল তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারের।

উপরোল্লিখিত তথ্যাবলী একথাই স্পষ্ট করে তোলে যে, কর্মজীবী মানুষের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকদের এই প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন্ উপায় গ্রহণ করা হবে তা বড় কথা নয়—বড় কথা এই যে, জাতির সমস্ত সদস্য সমভাবে লাভ ও ক্ষতির অংশীদার হবে। শ্রমিকদের এই প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা দিয়ে ইসলাম শোষণের বিরুদ্ধে যে গ্যারান্টি দিয়েছে শুধু তাই নয়—ইহা সকলের জন্য একটা সুন্দর জীবনও নিশ্চিত করেছে।

"সভ্যতা'-গর্বী পাশ্চাত্যে বর্তমানে যে মানবতা-বিধ্বংসী পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যবস্থায় তা কোনদিনই সম্ভবপর হত না। শরীয়ত কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত বা শরীয়তের মূল্যবোধের ভিত্তিতে আধুনিক পরিস্থিতির মুকাবিলার্থে প্রণীত ইসলামী আইনে পুঁজিবাদীকে শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করার

সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হত না। ইসলামী শাসনে ঔপনিবেশিকতা, যুদ্ধ ও জনগণের দাসত্ব প্রভৃতি পুঁজিবাদের প্রতিটি শয়তানীকেই নির্মমভাবে খতম করে দেওয়া হত।

ইসলাম শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইন ও বিধান রচনা করেই ক্ষান্ত হয় না। এ-সব আইন ছাড়াও ইসলাম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা ব্যবহারের প্রয়াস পায়। ইউরোপে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোন বাস্তব তাৎপর্য নেই বলে কম্যুনিস্টদের কাছে এ-সব আদর্শ উপহাসের সামগ্রী। কিন্তু ইসলামে কখনই বাস্তব অবস্থা থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পৃথক করে বিবেচনা করা যায় না। অন্তরের শুদ্ধিকরণ ও সমাজের সংগঠনের মধ্যে ইসলাম এক অদ্ভুত নিয়মে সমন্বয় সাধন করে। বাস্তবের সাথে আদর্শের কিভাবে সংযোগ ঘটান সম্ভব হবে এ-চিন্তায় বিমূঢ় হবার সুযোগ ইসলাম কাউকে দেয় না। ইসলাম একটি নৈতিক ভিত্তিতে এর আইন রচনা করে। তাই এর নৈতিক মূল্যবোধ এর আইনের সাথে সুসমঞ্জস হয়, এভাবে একে অপরের সম্পূরক হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোন সংঘাতের অবকাশ থাকে না।

স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিণামে তাদের মধ্যে বিলাস-ব্যসন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার উদ্ভব হয়। ইসলাম সর্বপ্রযত্নে একে নিষিদ্ধ ও নিরুৎসাহিত করেছে। এছাড়া কর্মচারীদের প্রতি বে-ইনসাফী করা এবং তাদের অপর্যাপ্ত বেতন দেওয়াকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কর্মচারীদের অপর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার ফলেই মজুত সম্পদ গড়ে ওঠে বলে একেও অবশ্যই নিরুৎসাহিত করতে হবে। ইসলাম মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র রাহে অর্থ ব্যয় করতে আহ্বান জানায়—এমন কি তাতে যদি তার সমস্ত অর্থও ব্যয় করতে হয়। ধনীরা আল্লাহ্‌র রাহের পরিবর্তে নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য অর্থ ব্যয় করে বলেই পুঁজিবাদী দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য ও বঞ্চনার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

ইসলাম মানুষের আত্মিক উন্নতির এমন ব্যবস্থা করে যা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলে এবং যা তা তাকে পার্থিব বিলাস-ব্যসন ও স্বার্থচিন্তা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালে তাঁর করুণা লাভের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য আত্মসমর্পিত এবং পরকালের পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, সে কিছুতেই অপরকে শোষণ করে বা হীন স্বার্থের লোভে পুঁজিকরণের জন্য উন্মত্ত হয়ে ছুটবে না।

এইভাবে নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ অর্থনৈতিক আইন-প্রণয়নের পথ এমনভাবে প্রশস্ত করতে পারে, যার ফলে পুঁজিবাদের অভিশাপ চিরকালের জন্য খতম করা যায়। পরিণামে এসব আইন যখন রচিত হয় তখন তার মান্যতাও সুনিশ্চিত হয়—কারণ এখানে শাস্তির ভয়ই শুধু থাকে না, বিকাশপ্রাপ্ত বিবেকের নির্দেশও এ ব্যাপারে সাহায্য করে।

উপসংহারে আমরা বলতে চাই, মুসলিম বিশ্বের স্কন্ধে আজ যে দানবীয় পুঁজিবাদ চেপে বসেছে তার সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং তার অশুভ পরিণতির জন্য জবাবদিহির দায়িত্ব ইসলামের নয়।

## ইসলাম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি

ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি স্বাভাবিক প্রবণতা প্রসূত? কম্যুনিস্ট ও তাদের সমদর্শীরা দাবী করে যে, না, তা নয়। তারা দাবী করে, প্রাচীনতম সমাজে, যখন "আদিম কম্যুনিজম" প্রচলিত ছিল, কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। তারা বলে, তখন সমস্ত দ্রব্যই ছিল সাধারণ সম্পত্তি, সমস্ত মানুষের তাতে অংশ ছিল এবং সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের ভাবধারায় সকলে উদ্বুদ্ধ ছিল। তারা বিলাপ করে যে, কৃষিকার্যের উদ্ভবের ফলেই অমন "দেবযুগ" টিকতে পারল না। কারণ কৃষিকার্যের উদ্ভবের ফলে কর্ষিত জমি ও উৎপাদনের হাতিয়ার নিয়ে গোল বেধে গেল, আর তারই পরিণামে লেগে গেল যুদ্ধ। কম্যুনিস্টরা বলে যে, মানুষ এই ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে "আদিম কম্যুনিজমে" প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে—যেখানে কোন ব্যক্তির নিজস্ব কোন সম্পত্তি থাকবে না এবং সমগ্র উৎপাদনের উপর সকলের সমান অধিকার থাকবে। তারা বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে শান্তি, সম্প্রীতি ও সুষমা ফিরিয়ে আনবার এই একমাত্র পন্থা।

মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা কিন্তু মানবীয় অনুভূতি, ধারণা ও আচরণকে প্রাকৃতিক ও অর্জিত—এই চুলচেরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে বিশ্বাস করেন না। অনুরূপভাবে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কেও ভিন্ন মত পোষণ করেন। কতক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অন্যেরা মনে করে যে, ইহা পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে অর্জিত। তারা বলেন, শিশু যে তার খেলনা অন্যকে দিতে রাযী হয় না, তার কারণ সম্ভবত খেলনার সংখ্যা কম, নতুবা অন্য কোন শিশু সেটা নিয়ে যাবে—এই

আশঙ্কা সে করে। তারা বলেন, দশটি শিশুর জন্য একটি খেলনা থাকলে ঝগড়া লেগে যেতে বাধ্য, কিন্তু দশটি ছেলের জন্য দশটি খেলনা থাকলে প্রত্যেকেই একটা করে পাবে এবং কোন সংঘর্ষই বাধবে না।

কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদর্শিত যুক্তির জবাবে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

১. কোন বিজ্ঞানীই এ যাবত সর্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করে এমন প্রমাণ দিতে পারেন নি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বভাবজাত নয়। বামপন্থীগণ এ যাবত এ ব্যাপারে যা বলতে পেরেছে সে হচ্ছে, এটা যে স্বাভাবিক প্রবণতা-প্রসূত তারও কোন চূড়ান্ত দলীল নেই। কিন্তু সেটি অন্য প্রশ্ন।

২. শিশু ও তার খেলনার যে দৃষ্টান্ত কম্যুনিস্টরা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে দিয়ে থাকে তা থেকে তাদের তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। দশটি ছেলেকে দশটা খেলনা দিলে যে ঝগড়া বাধে না, তার মানে এ নয় যে, ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক প্রবণতা সেখানে নেই। এটা বরং প্রমাণ করে যে, একটা সুস্থ পরিবেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাসনা নিরংকুশ সমতার মাধ্যমে পুরণ করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত উক্ত বাসনার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করে না, এর প্রকৃতি নির্ধারণে সহায়তা করে মাত্র। তাছাড়া একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এমন অনেক ছেলে আছে যারা বাধা না পেলে অন্যান্যদের খেলনা জবরদখল করতে দ্বিধা করে না।

৩. আদিম সমাজে একটি 'দেব-যুগ' ছিল বলে কম্যুনিস্টরা যে অনুমান করে এ সম্পর্কে বলা চলে যে, এমন একটি যুগের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন বাস্তব প্রমাণই নেই। এমন কি যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, এমন একটি যুগ ছিল তবুও সেখানে উৎপাদনের কোন হাতিয়ার ছিল না। সুতরাং যার অস্তিত্বই ছিল না তা নিয়ে দ্বন্দ্ব লাগবে কি করে? সে-সময়ে মানুষ সহজ পন্থায় বৃক্ষ হতে তাদের আহার্য সংগ্রহ করত। তারা যখন শিকার করতে যেত, বন্য জন্তুর ভয়ে তারা দলবদ্ধ হয়ে থাকত। নিহত জন্তু জমিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল। তাতে তা পচে গলে যেত। সুতরাং একে সাত-তাড়াতাড়ি তাদের খেয়ে শেষ করতে হত। তাই সেদিন সংঘর্ষ না থাকায় এটা প্রমাণ হয় না যে, ব্যক্তিগত অধিকারের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সেদিন সংঘর্ষ না থাকবার কারণ এই ছিল যে, সংঘর্ষের উপযুক্ত কারণই সেদিন ছিল না। এ জন্যেই কৃষিকার্য আবিষ্কারের সাথে সাথেই সংঘর্ষ দেখা দিল। উপরোক্ত আবিষ্কার মানুষের মধ্যকার এতদিনের সুপ্ত, এমন একটা প্রবণতাকে খুঁচিয়ে তুলল যার কর্মপ্রেরণা এতদিন ছিল না।

৪. একথা কেউই জোর করে বলতে পারবে না যে, সেই প্রাচীন যুগেও একটি বিশেষ নারীর উপর অধিকার কায়েমের জন্যে একাধিক পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগত না। কল্পনার সেই যুগে যৌন-সাম্যবাদ চালু থাকেনি অথবা উক্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও একটি সুন্দরী নারীকে পাওয়ার জন্যে একাধিক পুরুষেরা যে লড়াই করে নি একথা কেউ জোর করে প্রমাণ করতে পারবে না।

এর থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: যেখানে সব বস্তু সমান ও সদৃশ, সংঘাতের সম্ভাবনা সেখানে কিছুটা অস্বীকার করা যায়। কিন্তু দ্রব্যসমূহ যতদিন পৃথক ধরনের থাকবে, সংঘাত ও সংঘর্ষ সেখানে দেখা দিতে বাধ্য—এমন কি কল্পনার যে দেবসমাজের উপর কম্যুনিস্টরা তাদের ভাবী দুনিয়ার সমাজের স্বপ্নছবি অংকন করে সেটা সম্বন্ধেও একথা সমভাবে সত্য।

৫. সর্বশেষে, একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, প্রাচীন যুগে যারা বাস করত তাদের অনেকে সাহস, দৈহিক শক্তি বা অন্য কোনরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের বাসনা রাখত। তথাকথিত 'আদিম সাম্যবাদী সমাজের' দৃষ্টান্তরূপী কতক আদিম উপজাতি অদ্যাবধি এমন সব লোকের সাথে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দিতে অস্বীকার করবে যারা উহ্-আহ্ না করে একশতটি বেত্রাঘাত সহ্য করতে পারে না। নওজোয়ানরা যে এ ধরনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে আকৃষ্ট হয় তার একমাত্র কারণ যে ব্যক্তিগত গৌরব অর্জন, সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই।

সব জিনিসই যদি নিরংকুশ সাম্য-নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় তা হলে কিছু সংখ্যক লোক কেন নিজেদেরকে অন্যের সমান মনে না করে অন্যান্যদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, তার কারণ গবেষণা করে দেখতে হবে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের স্বভাবজাত প্রেরণা থেকে যদি উদ্ভূত নাও হয়, তবুও এটা অপর একটি স্বাভাবিক প্রবণতার ফল অর্থাৎ আদি যুগ থেকেই ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে, এটা তারই পরিণতি—ফল।

কম্যুনিস্টরা বলে থাকে যে, প্রত্যেক যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যেই অবিচার সংঘটিত হয়েছে এবং এজন্যেই মানুষ যদি শান্তি চায় ও তিক্ত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পেতে চায় তবে অবশ্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করতে হবে।

কিন্তু কম্যুনিস্টরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ সত্য ভুলে যায়: মানবতার অগ্রগতিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রচুর অবদান রয়েছে। তাছাড়া 'আদিম সাম্যবাদের' সেই তথাকথিত 'দেব-যুগে' কোন প্রগতিই সাধিত হয়নি। একথা বলা চলে যে, সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হবার পরই মানুষের প্রগতি শুরু হয়। অর্থাৎ এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র অভিশাপ নয়—বরং যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে এর অস্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন।

এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মানবতাবিরোধী সর্বপ্রকার অবিচারের মূলে—এমন কথা ইসলাম স্বীকার করে না। ইউরোপ ও অন্যান্য অমুসলিম দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে বে-ইনসাফীর সয়লাব বইয়ে এনেছে তার কারণ এই যে, ওসব দেশে সম্পদশালী লোকেরাই একাধারে আইন-প্রণেতা ও শাসক। এ অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এসব লোক এমন আইন রচনা করবে, যা অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থ বলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।

একটি বিশেষ শাসকশ্রেণীর অস্তিত্ব ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামে বিশেষ কোন সুবিধাভোগী শ্রেণী আইন রচনা করে না—সমস্ত শ্রেণীর স্রষ্টিকারী আল্লাহ্ তা'আলাকেই ধরা হয় মূল আইন প্রদাতা। এটা কল্পনা করা যায় না যে, আল্লাহ্ কতক ব্যক্তি বা শ্রেণীর যূপকাষ্ঠে অন্যান্যদের স্বার্থ বলি দেবেন। এ ধরনের পক্ষপাতিত্বে তাঁর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? ইসলামের মতে সমস্ত মুসলিম মিলে স্বাধীনভাবে শাসক নির্বাচন করবেন। কোন শ্রেণীগত বিবেচনায় তাঁকে মনোনীত করা হয় না। দায়িত্ব গ্রহণের পর শাসনকর্তাকে এমন এক আইন অনুসরণ করতে হয়, যা তিনি নিজে রচনা করেননি, যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা.)-এর একটি উক্তি উল্লেখ করতে পারি: "তোমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে আমি ততক্ষণই তোমাদের আনুগত্যের অধিকারী, যতক্ষণ আমি আল্লাহ্‌র অনুগত থাকি। যখন আমি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করব, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো না।" শাসনকর্তা নিজের উপর বা অন্য কারো উপর আইন রচনার কোন বিশেষ অধিকার আরোপ করবে—ইসলামে এমন কোন বিধান নেই। এক শ্রেণীর বদলে আরেক শ্রেণীকে খাতির করা অথবা সম্পদশালী শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাবে অন্যান্যদের উপর শোষণ চালিয়ে সম্পদশালী লোকদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ক্ষমতা ইসলাম শাসনকর্তাকে দেয় না।

একথা স্পষ্টভাবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, যখন আমরা ইসলামী শাসনের কথা বলি তখন ইসলামী ইতিহাসের সেই যুগের কথাই বলে থাকি যখন

ইসলামের নীতি ও শিক্ষাকে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যকরী করা হয়েছিল। আমরা কিছুতেই সে-সব আমলের কথা বলি না, যখন তাকে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত করা হয়। ইসলাম ওসব (রাজতন্ত্রী) সরকারকে স্বীকার করে না এবং ওসব শাসনের জন্যে ইসলামকে দায়ী করাও চলে না।

ইসলামী শাসন তার ইনসাফ ও আদর্শবাদ নিয়ে মাত্র সংক্ষিপ্ত কাল স্থায়ী হয়েছিল বলে এটাও মনে করবার কারণ নেই যে, এটা এমন একটি কাল্পনিক ব্যবস্থা যার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। যা একদা সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছিল তা পুনর্বার বাস্তবায়িত হতে পারে এবং সমস্ত মানুষের কর্তব্য সে ধরনের একটি আদর্শ ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্য যে-কোন যুগ অপেক্ষা বর্তমান যুগ সর্বাধিক উপযোগী।

ইসলামী শাসন-ব্যবস্থায় সম্পদশালী লোকগণ শুধুমাত্র তাদের স্বার্থে কোন আইন প্রণয়ন করতে সুযোগ পাবে না। ইসলামের বিধানমতে সমস্ত মানুষকে একই আইনের দ্বারা শাসন করা হবে, মানবীয় অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনরূপ তারতম্য করা হবে না। কোন আইনের বিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য উপস্থিত হলে—যা পৃথিবীর যে-কোন আইনের ব্যাপারেই হতে পারে আইনবিদগণ শেষ রায় দেবেন। একথা গৌরবের সাথে উল্লেখ করা যায় যে, খ্যাতনামা মুসলিম আইনবিদদের কেউই কখনই কোন আইনের এমন ব্যাখ্যা দেন নি, যার দ্বারা দরিদ্রদের পরিবর্তে সম্পদশালী লোকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। তারা বরং শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক দাবী পূরণ ও তাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের উপর আগাগোড়া বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অনেক মুসলিম আইনবিদ (ফকীহ্) মালিকের মুনাফায় শ্রমিকের শরীকানাও দাবী করেছেন।

অপরদিকে, ইসলাম মানব-প্রকৃতিকে কখনও এত জঘন্য মনে করে না যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেই সে বে-ইনসাফী ও জুলুমবাজি শুরু করে দেবে। মানব প্রকৃতিকে সংযত ও শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে ইসলাম অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। অনেক মুসলমান সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও 'তারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কোন বাসনা-কামনাই পোষণ করে নি, বরং অন্যদেরকে সেগুলো দান করে দিয়ে নিজেদের জন্যে সহজ সরল জীবন বেছে নেয়।" (কুরআন—৫৯ : ৭)। তাঁরা স্বেচ্ছায় অন্যকে তাদের সম্পত্তি দিয়ে দেন এবং এর জন্যে আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও রহমত ছাড়া আর কিছুই প্রতিদান চান নি।

এসব সুমহান বিরল দৃষ্টান্তসমূহ সর্বদা স্মরণে রাখা আমাদের কর্তব্য। এগুলো সীমাহীন অন্ধকারে আলোকচ্ছটা। বিশেষ—ভাবী দুনিয়ার মানবতার বিকাশে এসব মহৎ আদর্শ আলোকবর্তিকারূপে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে।

একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, ইসলাম আমাদের স্বপ্নের রাজ্যে বাস করতে বলে না—ইহা জনস্বার্থকে অনিশ্চিত 'সদিচ্ছার' উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে রাখে না। আত্মার শুদ্ধি ও উন্নয়নের উপর অত্যধিক নজর দেওয়া সত্ত্বেও ইসলাম কখনও বাস্তব বিবেচনা ভুলে যায় না। ইসলামী আইন সম্পদের সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা বিধান করে। শুধুমাত্র আত্মার শুদ্ধিকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ইনসাফসম্মত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলাম সুস্থ সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। তৃতীয় খলীফা উসমান বিন আফ্‌ফান নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে সম্ভবত সেকথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন: "কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ যা সংযত করেন না, শক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা নিয়ন্ত্রণ করেন।"

ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নে পুনরায় ফিরে আসা যাক। কোন কোন যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বে-ইনসাফী হয়নি। ইসলাম ভূমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু কখনও ইউরোপের ন্যায় একে সামন্তবাদে পরিণত হবার সুযোগ দেয়নি। ইসলাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এমন সব আইন প্রণয়ন করেছিল যার ফলে সামন্তবাদ গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি এবং যাদের ভূসম্পত্তি ছিল না তাদের জন্যেও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা ছিল এসব আইনে। এ নিশ্চয়তাই সম্পদশালী লোকদের দ্বারা দরিদ্র শ্রেণীকে শোষণের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ইসলামে ধনবাদ ছিল, তবে বুঝতে হবে, ইসলাম সেই ধনবাদই স্বীকার করে, যা জনস্বার্থের জন্যে কল্যাণকর। মানব-প্রকৃতির শুদ্ধিকরণ ও উন্নয়ন সাধন এবং সাথে সাথে যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলাম যে ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাতে ধনবাদ তার অত্যাচারমূলক ও শোষণমূলক পর্যায়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পায় না। ইসলাম বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্বের দুরবস্থার অবসান করতে পারত। তাছাড়া ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে অনুমতি দেওয়া হয় তা একাধিক বিধি-নিষেধের ফলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন এর বিধান মতে সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রূপে গণ্য হবে। ইনসাফের খাতিরে যেখানেই দরকার হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে এবং অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক গ্যারান্টি ছাড়া এর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না।

আমাদের বক্তব্যটি খোলাসা করবার উদ্দেশ্যে আমরা কতিপয় অমুসলিম দেশের (অর্থাৎ স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়ান রাষ্ট্রপুঞ্জ) দৃষ্টান্ত প্রদান করতে পারি। বর্ণগত ও জাতিগত বৈষম্যের প্রবক্তা ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসী জাতিত্রয় একথা স্বীকার করে যে, স্ক্যাণ্ডিন্যাভীয় জাতি দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে সুসভ্য ও স্নেহপরায়ণ জাতি। এখানে স্মরণ করা দরকার যে, এসব দেশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করে নি—তারা সম্পদের সুষম বন্টনের জন্যে প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা বিধান করেছে মাত্র। এসব গ্যারান্টির ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে এবং কাজ অনুপাতে মজুরী ধার্যের ব্যবস্থা হয়েছে। একথা বলা চলে যে, এতে করে ইসলামের কতিপয় দিকের বাস্তবায়নে স্ক্যাণ্ডিন্যাভীয় দেশসমূহ পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশ থেকে ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে।

কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই তার অন্তর্নিহিত সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন থেকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। আজকের বিশ্বের পুঁজিবাদ, কম্যুনিজম ও ইসলাম—এই তিনটি মতবাদ আমরা যদি পর্যালোচনা করে দেখি, আমরা বুঝতে পারব প্রতিটি মতবাদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মালিকানা-তত্ত্ব তার সামাজিক দর্শনের সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে জড়িত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যক্তিসত্তা অলঙ্ঘনীয় এবং কোনরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধের দ্বারাই তার স্বাধীনতা খর্ব করা চলবে না—এই ধারণার উপর পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই পুঁজিবাদ অবাধ ব্যক্তি-মালিকানার অনুমতি দেয়।

অন্যদিকে কম্যুনিজম এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সমাজই মূল বুনিয়াদ এবং ব্যক্তির কোন পৃথক সত্তা থাকতে পারে না। সুতরাং কম্যুনিজম (সমাজের প্রতিভূরূপী) রাষ্ট্রের হস্তে সমস্ত প্রকার সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা অর্পণ করে এবং সমস্ত ব্যক্তিকেই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

ইসলাম একটি স্বতন্ত্র সামাজিক দর্শনে বিশ্বাসী। তাই তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের ধারণা এই যে, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে দুটি সত্তা বিদ্যমান—একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিরূপে অপরটি সমাজের সদস্যরূপে। কোন এক বিশেষ পর্যায়ে কোন একটি সত্তার আবেদন অপর সত্তা থেকে বৃহত্তর হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে উভয়ের সম্মিলন ও সমন্বয় সাধনই স্বাভাবিক।

এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে সামাজিক ধারণা গড়ে ওঠে তা যেমন কোন ব্যক্তিকে তার সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখে না, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজকে দ্বন্দ্বরত দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তিরূপেও বিবেচনা করে না। ব্যক্তির যেমন

একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তেমনি সমাজের সদস্য হিসাবেও তার সত্তা বিদ্যমান। সুতরাং এমন আইন প্রণয়ন প্রয়োজন, যা ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে এবং ব্যক্তির স্বার্থ ও অন্যান্যদের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে। একের খাতিরে অপরের স্বার্থ বিপন্ন না করেই সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। সমাজের নামে যেমন ব্যক্তিকে খতম করে দেওয়া আইন রচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়—তেমনি এক বা একাধিক ব্যক্তির কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটতে দেওয়াও চলবে না।

ইসলামের অর্থ-ব্যবস্থা উপরোল্লিখিত সামঞ্জস্য-তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে—এক দিক দিয়ে এটা পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যবর্তী সুস্থ পন্থা। উভয় মতবাদের ক্ষতিকর দিক বাদ দিয়ে উৎকৃষ্ট দিকগুলোর সমন্বয় এখানে সাধিত হয়েছে। নীতিগতভাবে ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দিলেও তার উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে যে, তার ফলে ইহা সম্পূর্ণ নির্দোষ জিনিসে পরিণত হয়। সমাজ ও তার প্রতিনিধিরূপে শাসককে ইসলাম মালিকানা সংগঠন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনবোধে জনস্বার্থের খাতিরে চলতি আইন সংশোধনের ক্ষমতা দেয়।

ইসলাম ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দেয়, কারণ এর থেকে উৎসারিত অকল্যাণ দূর করার ক্ষমতাও তার আছে। মনে রাখা দরকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বাভাবিক প্রবণতা-প্রসূতও নয়, মানবিক প্রয়োজনও নয়—এ ধরনের অনুমানের ভিত্তিতে তাকে সরাসরি উচ্ছেদ করার চাইতে নীতিগতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দিয়ে সমাজের উপর তার সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্পণ করা অধিকতর কল্যাণকর ব্যবস্থা। সোভিয়েত রাশিয়াও (ক্ষুদ্রাকারে) কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত মালিকানার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। এর থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়ের স্বার্থে মানব-প্রকৃতির চাহিদা পূরণ করাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

আমরা কেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করব? ইসলামকে যে আমরা তা উচ্ছেদ করতে আহ্বান জানাব তাতে কোন্ মহান লক্ষ্য অর্জিত হবে?

কম্যুনিজম বলতে চায়—মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আধিপত্য ও ক্ষমতা বিস্তারের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করবার জন্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ একমাত্র পন্থা। রাশিয়া উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা উচ্ছেদ করেছে; কিন্তু সে কি এই উচ্ছেদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিল করতে পেরেছে? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়ায় যাদের শক্তি আছে তাদের জন্য

অতিরিক্ত মজুরীর বদলে অতিরিক্ত সময় শ্রমদানের ( overtime work ) একটি স্বেচ্ছামূলক প্রথা প্রবর্তিত হয়। এর মাধ্যমে রাশিয়া শ্রমিকের মজুরীতে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

রাশিয়ায় সমস্ত লোকই কি একই রূপ মজুরী পায়? ডাক্তার ও নার্সরা কি সমান বেতন পায়? কম্যুনিস্ট প্রচারবিদরা প্রায়ই বলে বেড়ায়, রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়াররা সর্বাধিক বেতন পায় এবং শিল্পীদের আয় সর্বোচ্চ। এসব কথার মাধ্যমে তারা অজান্তে স্বীকার করে বসেন যে, রাশিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরীতে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য শুধু যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তা নয়, একই শ্রেণীর বিভিন্ন লোকের মধ্যেও এই পার্থক্য বিদ্যমান।

কম্যুনিস্ট রাশিয়া কি মানুষের আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা বা ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা উচ্ছেদ করতে পেরেছে? তাই যদি হয়, তবে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, কারখানার ম্যানেজার, সিনিয়র কর্মকর্তা ও কমিশনার মনোনয়ন করা হয় কিভাবে? ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য বেছে বের করাই বা কিরূপে হয়?

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ বা অনুমোদনের প্রশ্নের বাইরেও মানব-প্রকৃতিতে আধিপত্য লাভ ও ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে—এ সত্য কি আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত নয়?

কম্যুনিজম যাকে বিরাট অভিশাপ বলে মনে করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের দ্বারাও মানুষ যখন তার হাত থেকে মুক্তি পায় নি—আমরা কেন তার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাতময় একটি পন্থা বেছে নেব এবং এক অসম্ভব লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করব?

কম্যুনিজম যদি বলতে চায় যে, রাশিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর ও ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য এত কম যে, তার ফলে বিলাসিতা বা বঞ্চনা কোনটাই সম্ভব নয়—তাহলে আমরাও বলব যে, কম্যুনিজমের জন্মের তের শত বৎসর পূর্বেই ইসলাম মানুষের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং এমন এক সমাজ কায়েম করেছিল, যেখানে বিলাসিতা ছিল নিষিদ্ধ আর দারিদ্র্যের করা হয়েছিল মূলোৎপাটন।

# ইসলাম, কমিউনিজম ও ভাববাদ

## ইসলাম ও কমিউনিজম

আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি—ইসলাম জীবনে যা কিছু মহৎ, সুন্দর ও বাঞ্ছিত তাকেই সমর্থন করে। এটা সর্বকালের, সব মানুষের ও সব সমাজের ধর্ম। তবে যেহেতু গত চারশ' বছর ধরে মুসলিম বিশ্ব বিপর্যয়ের মধ্যে ছিল তাই ইসলামী বিধানের যে অংশ অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত তার কোন রূপায়ণ হয়নি। এমতাবস্থায় আমরা ইসলামকে আমাদের আত্মিক উন্নয়ন ও চিন্তার পরিশুদ্ধির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কমিউনিজমকে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করি না কেন? এতে তো আর আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ক্ষতি হচ্ছে না। এতে করে আমরা আমাদের নৈতিকতা, সামাজিক ঐতিহ্য ও প্রথাই যে শুধু রক্ষা করতে পারব, তা নয়—আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমান যুগের একটি অতি আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কায়েম করতে পারব।"

উপরে উল্লিখিত ধারায় যুক্তির মারপ্যাঁচ দিয়ে এক নতুন শুভঙ্করীর খেলা বেশ কিছুদিন ধরে কমিউনিস্টরা খেলতে শুরু করেছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রথম প্রথম তারা ইসলামের বিরুদ্ধে উগ্র মনোভাব গ্রহণ করে এবং এ সম্পর্কে নানারূপ সন্দেহ প্রকাশ শুরু করে। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল যে, তাতে ইসলামের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তারা যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তন করে প্রতারণা ও চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করল। তাই তারা যুক্তি দেওয়া শুরু করল: "কমিউনিজমের সাথে ইসলামের সংঘাতের কোন অবকাশ নেই; কারণ এর অন্য নাম সামাজিক ইনসাফ এবং নাগরিকদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণই এর কাজ। আপনারা ইসলামকে যে কমিউনিজমের বিরোধী বলেন, আপনারা কি একে সামাজিক ইনসাফের বিরোধী মনে করেন? ইসলাম নিশ্চয়ই সামাজিক ইনসাফের ভিত্তিতে গঠিত ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে পারে না।"

এই সব 'শুভঙ্করী' যুক্তির সাথে অতীতের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রদত্ত যুক্তির বেশ মিল রয়েছে। তারাও ইসলামকে প্রকাশ্যে আক্রমণের মাধ্যমে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু যখন তারা দেখতে পেল, এর ফলে মুসলমানরা সাবধান ও

সতর্ক হয়ে উঠছে, তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। তারা বলতে শুরু করল: "প্রাচ্যদেশে সভ্যতার বিস্তার সাধনই পাশ্চাত্যের একমাত্র লক্ষ্য। ইসলাম কি করে সভ্যতার বিরোধী হতে পারে—ইসলাম যখন নিজেই সভ্যতার জন্মদাতা?" তারা মুসলমানদের ভরসা দিল যে তারা সালাত-সিয়াম যিকর-আযকার বাদ না দিয়েও এই পাশ্চাত্য গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য তারা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ছিল যে, একবার যদি মুসলমানরা তাদের মতবাদের কাছে নতি স্বীকার করে তারা আর কিছুতেই নিজেদের ইসলামী চরিত্র বজায় রাখতে পারবে না। ফলে কয়েক পুরুষের মধ্যেই এই সভ্যতাকে তারা চিরকালের জন্য পর্যুদস্ত করে ফেলবে। তাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। পরিণতিতে মুসলমানদের মধ্যে কিছুদিনের মধ্যেই এমন একদল লোক সৃষ্টি হয়ে পড়ল, যারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল এবং যারা বরং ইসলাম সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান বা যুক্তি ব্যতিরেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ শুরু করল।

আলিয়াতি ও প্রতারণার সেই সাম্রাজ্যবাদী খেলাই কমিউনিস্টরা বর্তমানে খেলে চলেছে। তারা বলে যে, মুসলমানরা সালাত, সিয়াম ও ধর্মীয় পর্বাদি পালন করে যেয়েও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে কমিউনিজমকে গ্রহণ করতে পারে, কারণ এটা তাদের ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। একে সাদরে বরণ করে নিতে তাই তাদের দ্বিধা থাকবে কেন? কিন্তু এই যুক্তিদান কালেও এটা তারা বিলক্ষণ জানে যে, একবার তারা এই সভ্যতার প্রলোভনের কাছে মাথা নত করলে আর তারা মুসলমান থাকতে পারবে না। এরূপ ঘটলে তারা কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুসলমানদেরকে তাদের নিজেদের জীবন-দর্শনের আলোকে পুনর্গঠিত করে ইসলাম ও তার বিধানকে ইতি করে দেবে, কারণ আমরা যে যুগে বাস করছি তা দ্রুতগতি ও পরিবর্তনশীলতার যুগ। আর এ যুগে অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান আছেন, যারা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে এরূপ কু-যুক্তির শিকার হবার সুযোগ দেন। এর কারণ—এতে করে অন্ততঃ তারা মুসলমান হিসাবে তাদের কঠোর কর্তব্য পালনের সংগ্রাম থেকে বাঁচবার একটা অজুহাত পান এবং মুসলমান হিসাবে নিজের পথ অনুসন্ধান, নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ এবং গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জটিল কর্তব্য থেকে মুক্তি পান। এর চাইতে বসে বসে অলস স্বপ্ন দেখা এবং অন্যদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া তারা বেশি পছন্দ করেন।

এ পর্যায়ে আমরা বলতে চাই যে, সে-ব্যবস্থা মূলগতভাবে ইসলামী নীতির বিরোধী নয় এবং যা পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত মুসলিম সমাজের

বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে থাকে, ইসলাম নীতিগতভাবে তার বিরোধী নয়। আর আসল কথা এই যে, ইসলাম আর কমিউনিজমের দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই একরূপ নয়, যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে কোন কোন বিষয়ে এ দুয়ের মধ্যে মিল দেখা যায়। মুসলিম সমাজের সামনে যখন সর্বোত্তম ব্যবস্থা আছে তখন এর পক্ষে ইসলাম অবহেলা করে কমিউনিজম, ধনতন্ত্র বা জড়বাদী সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব নয়—যদিও কোন কোন বিষয়ে এগুলোর সাথে ইসলামের মিল দেখা যায়। কারণ আল্লাহ্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন: "যারা আল্লার অবতীর্ণ বিধান অনুসারে সমাজ পরিচালনা করে না তারা কাফির।" (কুরআন—৫ : ৪৭)

আমরা কি বাস্তবে কমিউনিজমকে গ্রহণ করেও মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করতে পারি? এর জবাব একটি বৃহৎ না, কারণ যদি আমরা (ভুলক্রমে বা অসাধুভাবে নেহায়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণিত) কমিউনিজম বাস্তবে প্রয়োগ করি, আমরা দেখব যে তত্ত্বগত বা বাস্তব উভয় দিক দিয়ে এটা ইসলামের বিরোধী। এ দুইয়ের সংঘাত অনিবার্য, কারণ দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ হিসাবে এই সংঘাত এড়াবার কোন উপায় নেই।

এ দুটি যে বহু বিষয়ে তত্ত্বগতভাবে পরস্পর-বিরোধী, নিম্নোক্ত আলোচনা হতে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে:

প্রথমত, কমিউনিজম সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে: ইন্দ্রিয়শক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না—এমন কিছুতে এটা বিশ্বাস করে না। যা ইন্দ্রিয়শক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না তাই অসত্য, অর্থহীন এবং অস্তিত্বহীন, অথবা যদি বা তার অস্তিত্ব থেকেও থাকে তবুও তা এত তুচ্ছ যে, তা নিয়ে কারো মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এঙ্গেলস বলেছেন, "পৃথিবীতে বস্তুই একমাত্র বাস্তব সত্য।" বস্তুবাদীরা যুক্তি দেখায়: "মানব যুক্তি বস্তুর বহিঃপ্রকাশ মাত্র আর এটা বাহ্যিক বস্তুগত পরিবেশকেই প্রতিফলিত করে।" তারা আরও বলে, এটা যাকে আত্মা বলা হয় তার কোনই নিজস্ব স্বাধীন সত্তা নেই, এটা বরং বস্তুরই পরিণতি। সুতরাং আমরা দেখতে পাই কমিউনিজম সম্পূর্ণরূপে একটি জড়বাদী আদর্শ যা আধ্যাত্মিকতা বা আত্মা সম্পর্কিত সব কিছুতেই অবৈজ্ঞানিক বলে আখ্যায়িত করে। অপরপক্ষে ইসলামী আদর্শ মানুষের কর্ম-জগতকে এতখানি সংকীর্ণ করতে এবং মানুষের জীবনকে এত নিম্নস্তরে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। এটা মানুষকে এমন এক সত্তা হিসাবে কল্পনা করে যা আত্মা ও মন-জগতে বহু ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে অভিলাষী—যদিও সে মাটির উপরই বিচরণ করে এবং

যদিও তার রক্তমাংসের দেহ রয়েছে। আর কার্ল মার্কস যেমনটি বলতে চেয়েছেন মানবীয় প্রয়োজন খাদ্য, আশ্রয় ও যৌন সঙ্গমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোন কোন পাঠকের মনে এই পর্যায়ে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। এই জড়বাদী দর্শনের সাথে যদি আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকে, তবে আমাদের এটা কি ক্ষতি করবে?—আমরা তো শুধু কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং আমাদের মৌলিক বিশ্বাস, আমাদের আল্লাহ্‌, আমাদের রসূল এবং আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা অক্ষুন্নই রাখব। অর্থনৈতিক কর্মসূচী দ্বারা এ সবের কি ক্ষতি হবে, কারণ এটা উপরোল্লিখিত বিষয় থেকে স্বতন্ত্র এবং এর একটি স্বাধীন সত্তা আছে। এ বিষয়ে কিন্তু কারো কোন বিভ্রান্তির মধ্যে থাকবার অবকাশ নেই। কেননা, কমিউনিস্টরা নিজেরাই বিশ্বাস করে যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মৌলিক বিশ্বাস, আদর্শ জীবন দৃষ্টির মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে,, এগুলোকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে দেখা যায় না; এগুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কারণ, কমিউনিস্ট দর্শনের পুরোধা কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস তাদের লেখার মাধ্যমে একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ভেজাল বস্তুবাদী জীবন-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও বলা যেতে পারে যে কমিউনিস্টরা দ্বান্দ্বিক জড়বাদে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে যে, প্রাথমিক কমিউনিস্ট যুগ থেকে শুরু করে দাসপ্রথা, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ হয়ে চূড়ান্ত কমিউনিস্ট পর্যায় পর্যন্ত মানব সমাজ যত সব অর্থনৈতিক ও মানবিক প্রগতি অর্জন করেছে তার মূলে রয়েছে বিপরীত-ধর্মী দুই সত্তার (ধনী ও দরিদ্র তথা মালিক ও শ্রমিকের) মধ্যে সংঘর্ষ। এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদের ভিত্তিতেই তারা তাদের নীতির যথার্থতা প্রমাণ করে এবং দাবী করে যে, বর্তমানের আদর্শিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে কমিউনিজমের চূড়ান্ত বিজয় আসবে। তারাই দাবী করে যে, কমিউনিজম ও দ্বান্দ্বিক জড়বাদের তত্ত্বের মধ্যে নিবিড় বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক রয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদের মধ্যে আল্লাহ রসূল বা ধর্মের ধারণার কোন স্থান নেই। গর্বভরে তারা বলে বেড়ায় যে আল্লাহ, রসূল, ধর্ম প্রভৃতি ধারণা অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাবে সৃষ্ট; যেসব অর্থনৈতিক পরিবেশ এই সব ধারণার সৃষ্টি করেছে তার বাইরে এগুলোর কোন মূল্য বা তাৎপর্য নেই। এ কারণেই মানবজীবনে এসব ধারণার গুরুত্ব ফুরিয়ে যায় এবং জীবন ও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় এগুলোর কানাকড়ি মূল্যও থাকে না। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা, তার পরিবর্তন আনলেই সমগ্র মানব জীবনে পরিবর্তন আনা ও তাকে বিপ্লবায়িত করা সম্ভব। মানব ইতিহাস

সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মতবাদের অসারতা ও দুর্বলতা প্রমাণের জন্য আরবের ইসলামী বিপ্লবের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। তারা এই মহান বিপ্লবের কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। তারা এটা দেখাতে পারবে না যে, তৎকালীন আরব উপদ্বীপ বা সমসাময়িক মুসলিম জগতে উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন কোন পরিবর্তন এসেছিল যার ফলে বিশ্বের সেই অংশে রসুলে করীমের আবির্ভাব ঘটে আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ নতুন জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ও কমিউনিজম মূলতই পরস্পর বিরোধী। সুতরাং উভয়কে কি করে এক বলা যায়? মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ রহমানুর রহীম এবং সর্বজীবে দয়াশীল। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ মানুষের সুপথ প্রদর্শনের জন্য রসুল প্রেরণ করেন। মুসলমানরা বিশ্বাস করে, ইসলাম অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর পরিণতিতে সৃষ্টি হয়নি। এসব যারা বিশ্বাস করে সেই মুসলমানরা কি করে কমিউনিজমকে গ্রহণ করবে, যা বলে বেড়ায় যে মানব প্রগতির সব কিছুই শুধুমাত্র পরস্পর বিরোধী সংঘাতের ফলে অর্জিত হয়েছে। সেখানে অর্থনৈতিক পরিবেশ বা তাগিদের বাইরে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা অন্য কোন কারণ বা উদ্যোগের কোন স্থান নেই।

দ্বিতীয়ত, কমিউনিজমের দৃষ্টিতে মানুষ একটি অসহায় জীব মাত্র--বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক শক্তির মুকাবিলায় যার ইচ্ছার কোন গুরুত্ব নেই। কার্ল মার্কস বলেন: "জীবনের বৈষয়িক উপাদানের উৎপাদন ব্যবস্থাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মানুষের চেতনা তার জীবন-পদ্ধতি নির্ধারণ করে না, বরং তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনা নির্ধারণ করে।

অপর পক্ষে ইসলামী মানুষকে দেখা হয় একটি সক্রিয় সত্তারূপে—যার নিজস্ব ইচ্ছা রয়েছে যা শুধুমাত্র আল্লাহর উচ্চতর ইচ্ছা দ্বারাই প্রভাবিত হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুকে তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।" (পবিত্র কুরআন—৪৫ : ১৩)

এভাবে ইসলাম এটা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, এই পৃথিবীতে মানুষকে পরম উচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং যাবতীয় বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক শক্তির উপর তাকে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হয়েছে। আর ইসলাম স্বয়ং এর অন্যতম দৃষ্টান্ত; দ্বান্দ্বিক জড়বাদের কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা ইসলামের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়নি। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ কখনো এক মুহূর্তের

অন্যও মনে করেনি যে শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবনই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্কসের ন্যায় একথাও তারা বিশ্বাস করতেন না যে, এটা তার সচেতন নিয়ন্ত্রণের বাইরে, বরং ইসলামের শিক্ষার আলোকে তাদের যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কাদি পুনর্বিন্যস্ত করে সচেতনভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিধানের ভিত্তিতে তাদের অর্থনীতি গড়ে তোলেন: অর্থনৈতিক লাভালাভের বা প্রেরণার তোয়াক্কা না করে তারা দাসদের মুক্তি দিয়েছেন; এবং তৎকালীন ও তৎপরবর্তী ইউরোপ ও বৃহত্তর বিশ্বে কয়েক শতাব্দী যাবত সামন্ত-তন্ত্রের অবাধ রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের দেশে সামন্তবাদ গড়ে উঠতে দেন নি।

কমিউনিস্ট অর্থনীতি অনিবার্যরূপে কমিউনিস্ট দর্শনের দিকে ঠেলে দেবে। আর এ এমন এক দর্শন যা তার ইচ্ছাশক্তির সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে তাকে অর্থনৈতিক শক্তির হাতের পুতুলে পর্যবসিত করে; এই দর্শনের বক্তব্যানুসারে মানুষ তার জীবনের গতি পরিবর্তন করতে পারে না, কোন রূপে তাকে প্রভাবিতও করতে পারে না; এই পরিবর্তনটা অসম্ভব, সুতরাং অচিন্তনীয়।

তৃতীয়ত, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' অধ্যায়ে[১] আমরা উল্লেখ করেছি যে, একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তার পশ্চাতের সামাজিক দর্শন থেকে পৃথক করে দেখা অসম্ভব। সুতরাং আমরা যদি কমিউনিজমকে একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচীরূপে গ্রহণ করি, আমাদের অবশ্যই এর সামাজিক দর্শনও গ্রহণ করতে হবে। আর এই দর্শন বলে যে, সমাজই একমাত্র বাস্তব সত্য এবং সমাজের সদস্যরূপে ছাড়া ব্যক্তির আলাদা কোন সত্তা নেই। এটা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ইসলাম ব্যক্তিকে প্রচুর গুরুত্ব দেয় এবং তার আদর্শ রূপায়ণে ব্যক্তির উপর অধিক নির্ভর করে। ইসলাম মানুষকে ভেতর থেকে সভ্য করে তোলে, যাতে সে স্বেচ্ছায় সমাজের সদস্য হিসাবে তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করে। এমনি করে এটা ব্যক্তিকে সমাজের সচেতন সভ্য হিসাবে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। এ এমন এক মর্যাদা, যেখানে তার নিজস্ব ইচ্ছা থাকে, অধিকার থাকে তার পেশা এবং কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের। শাসকের আদেশ মেনে চলবার স্বাধীনতা তার থাকে, আবার শাসক আল্লাহ-প্রদত্ত ইসলামের বিধান লংঘন করলে তাকে অমান্য করবার স্বাধীনতাও তার থাকে। এমনি করে ইসলাম একই সাথে প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজের নৈতিকতার অভিভাবক করে তোলে এবং যাবতীয় দুর্নীতি উচ্ছেদের দায়িত্ব দান করে। স্বাভাবিক, বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক কারণের দরুন ও

---

১. এই নামে প্রকাশিত পুস্তিকায়।

রকমটি সেই সমাজে ঘটতে পারে না, যেখানে ব্যক্তিকে তুচ্ছ পোকা-মাকড় বা নরদেহধারী বামনে পরিণত করা হয়, যেখানে তার ভাগ্য সম্পূর্ণত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে সরকার—কারণ সেখানে সরকারই অর্থনৈতিক উৎপাদনের যাবতীয় মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে।

সবশেষে, আমরা একথাও স্মরণ রাখব যে কমিউনিস্ট মতবাদ এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণই কোন সামাজিক জনমণ্ডলীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কাদি প্রভাবিত করে। ইসলাম মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক দিকের গুরুত্ব অস্বীকার বা খর্ব করে না বা নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে প্রাণবন্ত করে তুলতে কোন জাতির সামাজিক জীবনের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ভিত্তির গুরুত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু জীবন মানেই অর্থনীতি—এ ধরনের কোন ধারণা ইসলাম মূলতই স্বীকার করে না। ইসলাম একথাও বিশ্বাস করে না যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে অন্যান্য সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে। কথাটা পরিষ্কার করতে বাস্তব জীবন থেকে আমরা দৃষ্টান্ত নিতে পারি। মনে করা যাক—একই রূপ অর্থনৈতিক অবস্থার দু'জন যুবক রয়েছে। তাদের একজন উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং পাশবিক লালসা ও প্রবৃত্তির গোলামীতে মত্ত। অপরজন তার সম্পদের একটা যুক্তিসঙ্গত অংশ নিজে উপভোগ করে এবং তার বাড়তি শক্তিকে মানসিক ও আত্মিক বিকাশের কাজে ব্যয় করে। এই দুইজন যুবককে কি সমান ও একইরূপে মনে করা যায়? এই দুই ব্যক্তি কি তাদের জীবনে সমপরিমাণ গুণ, মহত্ত্ব ও সাফল্যের অধিকারী?

আর একটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। মনে করা যাক—একজন লোক, যার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যার কথা লোকে শ্রদ্ধা সহকারে শোনে এবং যার উপদেশ লোকে মেনে চলতে রাযী। অন্য একটি অকর্মা লোক, যার কোন ব্যক্তিত্ব নেই এবং নিজের পরিচিত মহলে শুধু হাসির খোরাকই যোগায়। এখন প্রশ্ন হল, এই লোকের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন কাজে আসে কি? প্রথমোক্ত ব্যক্তি যেরূপ মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করবেন তা কি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করা যায়?

আরেকটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। সুষমা ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী একটি মেয়েকে কি সুষমা ও সৌন্দর্যবিহীন অপর একটি মেয়ের সাথে তুলনা করা চলে? অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করলেই কি কুৎসিৎ মেয়েটির সব অসুবিধার অবসান হবে?

এই কারণেই ইসলামী চিন্তাধারার অর্থনৈতিক মূল্যের, বুনিয়াদী গুরুত্ব দেয় না—দেয় অন্যান্য মূল্যের বিশেষত নৈতিক মূল্যমানের। কারণ অর্থনীতির বাইরের অন্যান্য মূল্যই মানব জীবনের বুনিয়াদ রচনা করে। আর সেগুলোর যথাযথ সংগঠনের জন্য অর্থনীতির মতই কঠোর সাধনার প্রয়োজন। এজন্যেই এটা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে নিরন্তর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর জোর দেয়। আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যকার এই আধ্যাত্মিক সম্পর্কই বাস্তব জীবনে নৈতিক মূল্যমান লালনের উত্তম পন্থা। পার্থিব জীবনে মানুষ প্রায়শই বস্তুগত প্রয়োজনের গোলামী করে এবং পারস্পারিক কলহ, হিংসা-বিদ্বেষে মত্ত থাকে। নীচতার গ্লানিমায় পরিপূর্ণ এই জীবনকে ইসলাম এমন এক উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে প্রয়াস পায়, যেখানে মানুষ জাগতিক নীচ প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রেম, প্রীতি ও পুণ্যের এক স্বর্গীয় জগতে বিচরণ করতে পারে।

আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে—ইসলাম মানব জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তিকে মৌলিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানুষ হিসাবে তার ভাগ্যের উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার ছাড়াও এ জগতে এটা মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হলে এবং উপযুক্তভাবে সংগঠিত করা হলে মানব সমাজ গঠনে এটা অর্থনীতি প্রভৃতি অপরাপর উপাদান অপেক্ষা কম শক্তিশালী প্রমাণিত হবে না ; বরং সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য সমস্ত উপাদান অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকরী ও শক্তিশালী প্রমাণিত হবে। মুসলমানরা একথার সত্যতা প্রমাণের জন্য তাদের নিজেদের ইতিহাস থেকে প্রচুর প্রমাণ দিতে পারবে। এজন্যেই আমরা দেখি—প্রথম খলীফা আবুবকর তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে ভণ্ড নবী সমস্যার মুকাবিলায় কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন—যদিও উমর বিন্ খাত্তাবসহ অনেক মুসলমানই প্রথম দিকে এ প্রশ্নে তাঁর সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীয় মতে তিনি পর্বতের ন্যায় অটল থাকেন এবং এক বিন্দুও তা থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর এই প্রেরণা তিনি কোথেকে লাভ করেছিলেন? এটা কি জাগতিক শক্তি ছিল? অথবা অর্থনৈতিক কল্যাণের ধারণা? অথবা কোন মানব শক্তি তাঁকে এই সংকল্পে প্রেরণা যুগিয়েছিল? তার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর প্রেরণা ও সাহস এ ধরনের কিছুতেই যোগায়নি। এসবের কোন একটিতে যদি তাঁর বিশ্বাস থাকত তাহলে ইসলামের ইতিহাস সেই সংকট-মুহূর্তে তিনি কিছুতেই প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে সাহস পেতেন না। শুধুমাত্র আত্মিক শক্তির বলে বলিয়ান ছিলেন বলেই হযরত আবুবকর বিদ্রোহীদের সাথে সংগ্রামে নামবার ইচ্ছা, সংকল্প ও সাহস অর্জন করেছিলেন।

শুধু এই কারণেই তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে দুশমনী পরিত্যাগ করে পুনরায় সৎ মুসলমান হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। মানব ইতিহাসের এটা এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়, যা প্রমাণ করে জীবন্ত আত্মিক প্রেরণা কিভাবে নজীরবিহীন বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করতে পারে। উমর বিন আবদুল আযীযের ঘটনাও অনুরূপ। তিনি শুধুমাত্র আত্মিক শক্তির বলে বলিয়ান হয়েই প্রথম যুগের উমাইয়া শাসকদের সৃষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক বে-ইনসাফীর আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি অন্যায়ের মূলোৎপাটন করে ইসলামের অন্তর্নিহিত সামাজিক নীতিসমূহের ভিত্তিতে সাফল্যের সাথে সমাজের পুনর্গঠন করেন। ইসলামের ইতিহাসের সেই মুহূর্তেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যখন সমগ্র মুসলিম সমাজে একটিও দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সুতরাং ইসলাম আত্মিক শক্তিকে পরম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ এটা এর বিরাট অলৌকিক কল্যাণ থেকে মানব সমাজকে বঞ্চিত করতে চায় না—যদিও ইসলাম অলসভাবে বসে থাকা পছন্দ করে না এবং এর লক্ষ্য হাসিলে জাগতিক মাধ্যম ব্যবহারও বাদ দেয় না। ইসলাম আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে, তবে অলৌকিক কারামতের জন্য অলস প্রতীক্ষা পছন্দ করে না। এর চিরন্তন মূলনীতি হচ্ছে: "কুরআনে যার নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি আল্লাহ্ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করেন।"

অন্যদিকে কমিউনিজমের নির্দেশিত পথে অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা সাধনা করে নৈতিক মূল্যবোধের দিকে বা আত্মিক উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ কমিউনিজমে মানব জীবনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত অর্থনৈতিক দিকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে একদেশদর্শী উন্নয়নই সম্ভবপর হয় মাত্র। এটা এরূপ এক চিকিৎসা, যার দ্বারা শরীরের কোন একটি অঙ্গ—যেমন হৃদপিণ্ড বা যকৃত—এমন ভাবে স্ফীত করে যে তার ফলে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষম বিকাশ ও কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

আমরা জানি, এমন কিছু লোক আছেন যারা উপরোল্লিখিত ধারায় ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে এরূপ দার্শনিক তুলনা পছন্দ করেন না। কারণ, তারা মনে করেন যে, এসব তাত্ত্বিক আলোচনার কোন মূল্য নেই, এগুলোর গুরুত্ব বা তাৎপর্য কিছুই নেই। তাদের কাছে শুধু বাস্তব সমস্যারই দাম রয়েছে এবং সব রকমের তত্ত্বগত আলোচনার পরিবর্তে সেগুলোকেই যথাসম্ভব গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের মতে সব কিছুই শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে যাবে এবং কোন জীবন-পদ্ধতি গ্রহণের বেলায় তাত্ত্বিক প্রশ্ন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তার বাস্তবতাকেই বিবেচনা

করতে হবে। তাই তারা বাস্তব জীবনে ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে কি করে সংঘাত আসতে পারে তা ভেবে উঠতে পারেন না। তারা এ দুয়ের মধ্যে এরূপ কোন সংঘাতের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন।

সমস্যার তত্ত্বগত বা দার্শনিক দিক সম্বন্ধে তাদের অনীহার সাথে আমরা একমত নই। কারণ, তত্ত্বের দিক থেকে বাস্তবকে কোন দিনই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। যাই হোক, এদের বিবেচনার জন্য ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে কতকগুলো বাস্তব পার্থক্য আমরা এখানে তুলে ধরছি:

১. ইসলাম বিশ্বাস করে যে, মানব জাতির বংশ বিস্তারই মেয়েদের প্রধান কাজ। তাই এটা নেহায়েত জরুরী তাগিদ ব্যতিরেকে (যেমন পিতা, ভাই বা স্বামী না থাকলে) তার নিজ রাজ্য ত্যাগ করে কারখানা ও ময়দানে কাজ করাটা সমর্থন করে না। কিন্তু কমিউনিজম মেয়েদের কারখানা এবং ময়দানে পুরুষের সমান পরিশ্রম করতে বাধ্য করে কমিউনিজমের অন্তর্নিহিত দর্শনে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কর্মক্ষেত্র ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে পার্থক্য স্বীকার করে না। একথাটি আপাতত ভুলে গেলে কমিউনিস্ট অর্থনীতি মূলতই সর্বপ্রকার উৎপাদন বৃদ্ধির নীতির উপর নির্ভরশীল। এই বৃদ্ধি তখনই সম্ভব হয়, যখন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই কারখানা, লেবরেটরী ও ময়দানে পরিশ্রম করে। সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মেয়েদেরও এ ব্যাপারে সমান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তারা শুধু প্রসবকালীন সময়েই এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। এর ফলে বৃহদাকারের উৎপাদনের মত সন্তান-সন্ততি[১] পালন ও ছেড়ে দেওয়া হবে রাষ্ট্রের হাতে।

সুতরাং আমরা যদি কমিউনিস্ট অর্থনীতি গ্রহণ করি তার অন্যতম ফল দাঁড়াবে এই যে, মেয়েদেরকে তাদের ঘর ছেড়ে কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে। এর অর্থই হচ্ছে: ইসলামের অন্যতম মৌলিক সংস্থা পরিবার ব্যবস্থার উপর নির্মমভাবে আঘাত হানা হবে। অথচ এই পরিবার ব্যবস্থার উপরই ইসলামের নৈতিকতা ও অর্থনীতির সমস্ত কাঠামোটি দণ্ডায়মান এবং এটার মাধ্যমেই ইসলাম দেখাতে চায় যে, মেয়েদের প্রকৃত কাজ গৃহাভ্যন্তরে এবং পুরুষের কাজ বাইরে।[২] যদি বলা হয় যে, মেয়েদের কাজের জন্যে যে বাইরে কারখানায় পাঠানোই হবে তা ঠিক নয়। তবে বলতে হবে এটা এমন এক ব্যাপার হবে,

১. সন্তান পালনের সমস্যা সম্পর্কে 'ইসলাম ও নারী' শীর্ষক পুস্তিকায় আমরা আলোচনা করেছি।

২. এর দ্বারা অবশ্য পরিবারের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা অস্বীকার করা হয় না। যেমন কোন সমাজে কৃষক, শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা সত্ত্বেও সহযোগিতা সম্ভবপর।

যার সাথে কমউনিজমের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ কমিউনিস্টরা এ সম্পর্কে তাদের নীতি মোটেই অস্পষ্ট রাখেনি। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে একথা বলা যায় যে, এটা বেশ ভাল কথা এবং মানবীয় অস্তিত্বের জন্য এর প্রয়োজনও রয়েছে কিন্তু এর জন্য কমিউনিস্ট অর্থনীতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কমিউ-নিস্টরা নিজেরাও ইউরোপীয় ধনতন্ত্র থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় হাওলাত করেছে।[১] ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির তাগিদে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির যাবতীয় আধুনিক পন্থা গ্রহণে কোন বাধা থাকবে না।

২. কমিউনিস্ট অর্থনীতি প্রলেতারিয়েতদের পূর্ণাঙ্গ একনায়কত্বের উপর নির্ভরশীল। তার মানে হচ্ছে—বিভিন্ন নাগরিক কি কাজ করবে তা স্থির করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের এবং সেখানে তাদের শক্তি বা রুচির কোন প্রশ্নই থাকবে না। যাবতীয় চিন্তা, কর্ম ও সম্পর্কের বিষয়াদি এবং তাদের লক্ষ্য সবই নিয়ন্ত্রণ করবে শুধুমাত্র রাষ্ট্র। এই পর্যায়ে আমরা একজন ব্যক্তির একনায়কত্ব এবং রাষ্ট্রের (তথা প্রলেতারিয়েতের) একনায়কত্বের মধ্যকার পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করব। কারণ একজন শাসকের পক্ষে এমনটি হতে পারে যে, তিনি কল্যাণব্রতী, বিনয়ী চরিত্রের অধিকারী হবেন এবং দেশের কল্যাণ তাঁর প্রিয় হতে পারে এবং কোন বিষয় নির্ধারণ বা আইন প্রণয়নের সময় সৎ বা অসৎ জনপ্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শও করতে পারেন। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বা রাষ্ট্রের ডিক্টেটরশীপের পক্ষে এটা প্রায় অসম্ভবের শামিল। কারণ, এটা প্রধানত অর্থ-নীতির ব্যাপারে আগ্রহী এবং সে কারণেই কঠোর হস্তে সেই লক্ষ্য হাসিল করতে চাইবে। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব দ্বারা একথাই বোঝা যায়।

কমিউনিজমের উপরোল্লিখিত দোষত্রুটির তালিকায় আমরা আরও একটি বিষয় সংযোজন করতে পারি: এর কোন সুষ্ঠু ভিত্তি নেই, যার ফলে তত্ত্ব ও বাস্তবে প্রায়শই সংঘাত ঘটতে দেখা যায়। যেমন গোড়ার দিকে সেটা সব রকমের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমূল উচ্ছেদের ওকালতি করেছিল এবং সব রকমের কর্মচারীর মজুরী সমান করে দেয়ার দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ও অবস্থার চাপে এই নীতি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেলো যে, কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমতি দেওয়া এবং উৎসাহ ও শ্রমের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরীতে কিছুটা পার্থক্য রাখাই সুবিধাজনক। এমনি করে কমিউনিজম কার্ল মার্কসের দর্শনের দু'টি মৌলিক নীতি পরিত্যাগ করে

১. রাশিয়া কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ে শিল্পক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে ছিল। তাই এটা ইউরোপ থেকে অর্থনৈতিক উৎপাদনের সব পন্থা গ্রহণ ও সমৃদ্ধ করতে প্রয়াস পায়।

এবং ইসলামের নীতির দিকে বেশ খানিকটা অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে আমরা মুসলমানরা কি করে একমাত্র বাস্তব জীবন ব্যবস্থা ইসলাম পরিত্যাগ করতে পারি—অথচ মানবতা যখনই অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেছে বাস্তবের কষাঘাতে বারবার এদিকেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে?

## ইসলাম ও ভাববাদ [ Idealism ][১]

আমাদের প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়: "তোমরা মুসলমানরা যে ইসলামের কথা বলে বেড়াও, তা কোথায়? প্রকৃত প্রস্তাবে তা কি জীবনে কখনও বাস্তবায়িত হয়েছিল? একথা তোমরা হরদম বলে বেড়াও যে, এটা একটা অত্যন্ত আদর্শ ব্যবস্থা, কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কি কখনও অস্তিত্ব ছিল? এর বাস্তব রূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রসূলে করীম (সা.) খুলাফায়ে রাশেদীন অথবা তার মধ্যেও প্রথম দুই খলীফার ক্ষুদ্র শাসনকাল ছাড়া কিছু দেখতে পাই না। বিশেষভাবে উমর বিন খাত্তাবের কথা বলতে, তিনি যে ইসলামের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন তা বলতে তোমরা কখনো ক্লান্তি বোধ কর না। তোমরা তাকে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করে থাক কিন্তু তার শাসনামলের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিলে আমরা তো শুধু "স্তূপের পর স্তূপ অন্ধকার" সামন্তবাদ, অসাম্য, নির্যাতন, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও

১. Idealism প্রাচ্য ভূখণ্ডে একটি অতি জনপ্রিয় শব্দ। প্রাচ্যে এই শব্দ দ্বারা 'আদর্শবাদ' তথা এমন একটি ব্যবস্থা বোঝায়, যার মধ্যে সব রকমের ভাল বস্তুর সন্নিবেশ রয়েছে। এর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আমরা এটাকে এই অর্থে ইসলামের সাথে তুলনা করছি না, কারণ আমরা এর বিরুদ্ধে প্রদত্ত যুক্তির আলোকেই আলোচনা করছি। পাশ্চাত্যে যে অর্থে একে ব্যবহার করা হয় সেই 'ভাববাদ' অর্থেই আমরা এর ব্যবহার করছি। পাশ্চাত্য ব্যাখ্যার এই আইডিয়ালিজম তথা ভাববাদের অর্থ মাটির মানুষকে তার অদৃষ্ট, যন্ত্রণা, ক্ষুধা, দুঃখ ও অবিচারের মধ্যে ফেলে রেখে ভাবের রাজ্যে উড়ে বেড়ানো এবং মানুষের এই সব অভিশাপ দূরীকরণে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করা। এতে জনগণকে এই সব অভিশাপের কবলে অসহায়ভাবে ফেলে রাখা হয়। এ কারণেই ইউরোপীয়রা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এই 'আইডিয়ালিজম' শব্দটা ঘৃণা করতে শুরু করে। কারণ এতে প্রাত্যহিক জীবনের সাথে যার সম্পর্ক নেই এরকম সব বড় বড় দার্শনিক বুলি কপচিয়ে জনসাধারণকে সামন্তবাদের নির্যাতন ও অন্যান্য সব অত্যাচার-অনাচার সহ্য করে নিতে আহ্বান জানাত। এই সব তাত্ত্বিক বুলি কপচানো শুধু যে শূন্য বাগাড়ম্বরে-পর্যবসিত হতো তাই নয়, আসলেও এগুলো ছিল অর্থহীন। স্বাভাবিকভাবেই মানবীয় বুদ্ধি এই দার্শনিকতাকে ঘৃণা করতে শিখে। এই ঐতিহাসিক পটভূমির কারণেই ইউরোপীয়গণ সব রকমের আদর্শবাদকে উপহাস ও ঘৃণা করে। এই অবস্থাটাকে নিজেদের কাজে লাগাবার উদগ্র বাসনায় কমিউনিস্টগণ ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ শুষ্ক ও শূন্য ভাববাদের অভিযোগ এনে নিজেদের মূর্খতাই প্রমাণ করে।

পশ্চাদপদতা দেখতে পাই। তোমরা দাবী কর যে, শাসকগণ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ইসলাম জাতিকে তাদের শাস্তিদানের অধিকার দেয়, কিন্তু, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর শাসকদের শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, জনগণকে শাসক মনোনয়নের অধিকারটুকু কবে দেওয়া হয়েছিল? তোমরা আরও বল যে, ইসলাম সম্পদের সুষম বন্টনসহ একটি ইনসাফসম্মত অর্থনীতি দিয়েছে। কিন্তু মানুষে মানুষে পার্থক্য দূর করে, এমন কি খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় কবে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? তোমরা বলে থাক যে, ইসলাম সমস্ত নাগরিককে কাজ দেওয়া রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক করে, কিন্তু 'যে সব লক্ষ লক্ষ বেকার লোক সেদিন ভিক্ষা করে জীবন কাটাত অথবা আজীবন বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল তাদের সম্পর্কে কি বলতে চাও? তোমরা নারীর অধিকারের কথাও বলে থাক, কিন্তু তারা কি প্রকৃত প্রস্তাবে কোনদিন এইসব অধিকার উপভোগ করেছে? এটা কি সত্য নয় যে, প্রতিকূল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে তারা কখনো তাদের অধিকার ভোগ করতে পারেনি? তোমরা বল যে, আল্লাহ্‌-ভীতির ফলশ্রুতি হিসাবে মানুষের আত্মিক বিকাশ সাধিত হয় এবং তার ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার আলোকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কিন্তু একটি সীমিত কালের কথা বাদ দিলে, কবে কোথায় এই আত্মিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল? দরিদ্রের অধিকার হরণ করে তাদেরকে বে-ইনসাফী ও নিষ্ঠুরতার শিকারে পরিণত করার পথে ইসলাম কি কোন দিন প্রতিবন্ধক হয়েছিল? জনগণের অধিকার পদদলিত করে তাদেরকে জিল্লতী ও অবমাননার মুখে ঠেলে দেওয়ার পথে এটা কি কখনও বাদ সেধেছিল? মোটকথা, তোমরা এমন এক স্বপ্নরাজ্যের কথা বলে বেড়াও, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। যে সীমিত যুগের তোমরা এত ভক্ত তাও শুধু একথাই প্রমাণ করে যে, কতিপয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক এমন কিছু পরিমাণ অসম সাহসিক কাজ সম্পন্ন করেছিল, যা আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। এটা একটা ব্যতিক্রম, কারণ পরবর্তীকালে এর পুনরাবৃত্তি আর কখনো ঘটেনি এবং সেরূপ আর ঘটারও কোন সম্ভাবনা নেই।"

কমিউনিস্ট ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা এসব কথাই বলতে চায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক মুসলমানও এ ধরনের প্রচারণার শিকার হন। কারণ তাদের সাম্রাজ্যবাদী মনিবেরা তাদের যতটুকু শিক্ষা দিয়েছেন, তার বাইরে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে আর কিছুই জানেন না বা পড়েন নাই।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশের আগে আমরা দু'ধরনের ভাববাদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। বিশুদ্ধ ভাববাদ বলতে যা বোঝা যায়, বাস্তব জীবন-পরিবেশে তাকে কোনদিন প্রয়োগ বা রূপায়িত করার নজীর নেই। অপর পক্ষে আর এক ধরনের ভাববাদ (বা আদর্শবাদ) আছে যা সাফল্যের সাথে যে বাস্তবায়িত হতে পারে, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এটা এমন এক ধরনের আদর্শবাদ যা শুধু যে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে তা-ই নয়, এর নিজস্ব গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও এটা রাখে। সুতরাং যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তা হচ্ছে: ইসলাম কি মূলতই এমন একটি স্বাপ্নিক আদর্শ যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, জগতে কোথাও বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার শক্তি যার নেই এবং যার গোটা মতবাদটাই কতকগুলো কাল্পনিক ও মনগড়া অলীক উপাদানে গঠিত? অথবা এটা একটি বাস্তব জীবন-ব্যবস্থা; তবে মানব ইতিহাসের সর্ব যুগে সমান সাফল্যের সাথে ও সম্পূর্ণ একই ধারায় একে রূপায়িত করা চলে না? এটা সুস্পষ্ট যে, এই দুই ধরনের আদর্শবাদের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম যদি মূলতই একটি কল্পনামূলক আদর্শ হয়, তবে ভবিষ্যতে সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবন পরিবেশের যতই পরিবর্তন হোক, এর রূপায়ণের আর কোনই আশা নেই। কিন্তু এটা যদি একটি বাস্তব জীবন-ব্যবস্থা হয় এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক জীবন-পরিবেশের কারণেই যদি এর বাস্তব রূপায়ণ হয়ে থাকে, তবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। সে অবস্থায় জীবনের প্রতিকূল পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে এর রূপায়ণের খুবই আশা রয়েছে। এখন, ইসলামের ব্যাপারে এ'দুয়ের কোন্‌টি সত্য—আগেরটি না পরেরটি?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না, কারণ বিষয়টি এত স্পষ্ট যে এতে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ নেই। মানব ইতিহাসের এক পর্যায়ে ইসলামের পূর্ণাংগ রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল, এতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এটার বাস্তব জীবন-ব্যবস্থা এবং মানুষের দ্বারা এর পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন সম্ভবপর। এর থেকে আরও প্রমাণ হয় যে, এর ভিত্তি কাল্পনিক বা অলীক কিছু নয়। মানুষ মূলত অতীতেও যা ছিল বর্তমানেও তাই রয়েছে—মানুষের প্রকৃতিতেও কোন পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং যা একবার ঘটেছে তা বারবার ঘটতে পারে। আধুনিক প্রগতিবাদিগণ বলেন যে, এরূপটি আর ঘটবে না, সুতরাং ইসলামী পুনর্জাগরণ একটি অসম্ভব ব্যাপার। আমরা সবিনয়ে তাদের প্রশ্ন করতে চাই, তবে কি তারা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ নৈতিক

উন্নতির এমন উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, যা হাসিল করা মানুষের পক্ষে আর কখনো সম্ভব নয়? এরূপ বক্তব্য তারা কি করে সমর্থন করতে পারেন, তারা নিজেরা যখন দাবী করে থাকেন যে, মানবতা প্রতিনিয়ত প্রগতির পথে সামনে এগিয়ে চলেছে?

খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রথম দিকে একবার এবং পরে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিধিতে, যেমন উমর বিন আবদুল আযীযের খিলাফতকালে, এমনি ছিটেফোটা দু'একটা পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর মুসলিম ইতিহাসে দেখা যায় না। এমনটি কেন ঘটলো তার উত্তর পেতে হলে আমাদের প্রশ্নটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করতে হবে। ইতিহাসের পাতায় এর উত্তর অবশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। কখনো এর জবাব মেলে মুসলিম বিশ্বের কোন স্থানীয় ঘটনার আকারে, আবার কখনো মানবতার জীবন-ইতিহাসে উদ্ভাসিত কোন শাশ্বত সত্যের আকারে।

এ ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই নীচের দু'টি তথ্য বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত ইসলামের সাহায্যে মানবতার যে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলাম একে বর্বরতার যে অতল গহ্বর থেকে নৈতিক উৎকর্ষের উচ্চ শিখরে উন্নীত করেছিল তা ছিল এমন এক ঘটনা, জীবনের সাধারণ সূত্র দ্বারা যার কোন ব্যাখ্যা চলে না। ইসলাম এই পৃথিবীতে যেসব অসাধ্য সাধন করেছে, এটি ছিল তারই অন্যতম। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের নায়কদের বহু বৎসরের প্রস্তুতি ও সামগ্রিক নৈতিক সাধনার ফলে। তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তাঁরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন যে, তাঁরা সেই মহান আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

কিন্তু ইসলাম এমন তড়িৎ গতিতে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে যে, এর পূর্বের বা পরের কোন যুগে বিভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলনের ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। কমিউনিস্ট ও জড়বাদীরা মানব ইতিহাসের জড়বাদী বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে অত্যন্ত পটু, কিন্তু তারাও তাদের তত্ত্ব দিয়ে ইসলামের এই অলৌকিক বিস্তৃতির কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। ইসলামের এই দ্রুত প্রসারের ফলে এমন অনেক জাতি এর আওতাভুক্ত হয়, যারা ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণীর সাথে ভালভাবে পরিচিত হয়নি এবং এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত তাৎপর্যও অনুধাবন করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যবশত প্রথম যুগের আরবীয় মুসলমানদের মত এই সব মুসলমান সরকারের পক্ষে

নও-মুসলিমদের মধ্যে আদর্শগত তালিম বা নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে মুসলিম জাহানের সীমা বেড়ে যায়, বিশ্বাসীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়; কিন্তু নব দীক্ষিতদের অধিকাংশের অন্তরে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। ইসলামের অনুশাসন পদদলিত করতে শাসকদেরও তাই আর জনমতের তোয়াক্কা করতে হয়নি। তারা জনসাধারণের অধিকার হরণ করে সর্বপ্রকার জুলুম-নির্যাতনের মুখে তাদের নিক্ষেপ করে। উমাইয়া, আব্বাসীয়, তুর্কী ও মামলুকদের ইতিহাসে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুগঠিত ও জ্ঞানদীপ্ত জনমতের অনুপস্থিতিতে তারা সহজেই ইসলামকে খেলার পুতুলে পরিণত করে জনগণের অধিকার হরণ করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ত মানব জীবনে ইসলাম যে বিরাট অগ্রগতি সাধন করে, তাকে কিছুতেই একটি সাধারণ বা স্বাভাবিক ঘটনা বলে বর্ণনা করা যায় না। কারণ এটা মানবতাকে ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথার নিম্নতম পঙ্ক থেকে টেনে তুলে। এ যাবত পৃথিবীতে মানুষ যত রকমের সমাজ ব্যবস্থা পরখ করেছিল তার তুলনায় শ্রেষ্ঠতম ইনসাফ-সম্মত সমাজ ও রাষ্ট্র উপহার দিয়েছে। বেপরোয়া প্রবৃত্তি-তাড়না থেকে মানবতাকে মুক্তি দিয়ে ইসলাম মানব ইতিহাসে নৈতিক উন্নয়নের উচ্চতম শিখরে একে উন্নীত করে।

ইসলামই মানুষকে প্রথম যুগে এই অত্যাশ্চর্য সু-উন্নত নৈতিক উৎকর্ষ হাসিল করতে সাহায্য করেছিল। রসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণের জীবনে যে আত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল, ইতিহাসে তার অন্য কোন দৃষ্টান্ত মেলে না। এই শক্তি মানুষকে এত উচ্চস্থানে উন্নীত করেছিল, যা সাধারণভাবে হাসিল করা সম্ভব ছিল না। এর ফলে তারা এমন সব অসাধারণ কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল যা রীতিমত অলৌকিক বলে মনে হবে। যখন এই জীবন্ত অনুভূতিতে ভাটা পড়ল, জনগণ তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সুউচ্চ আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে তাদের পূর্বতন অবস্থায় অধঃপতিত হল। যদিও এর পরও তারা আল্লাহর রওশনিতে রওশনির একটা স্ফুলিঙ্গ অক্ষুণ্ন রাখল। এই আল্লাহ্‌র রওশনিতে উদ্ভাসিত ইতিহাসের পাতাগুলির দিকেই আমরা আমাদের বন্ধু সহযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিন্তু এর জন্য ইসলাম প্রবর্তিত পরিবর্তনের ন্যায় মানব জীবনে সামান্যতম পরিবর্তন আনতে হলেও স্বয়ং রসূল (সা) ও তাঁর সাহাবাদের উপস্থিতি অপরিহার্য বলে যারা মনে করেন তারা ভুল করেন। কারণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেরশ' বছর পূর্বে যা ছিল অলৌকিক ঘটনা, সাধারণভাবে মানবতা অথবা বিশেষভাবে

মুসলিম জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ,তার কল্যাণে এখন এটা এমন এক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, যা সমাধা করতে মানুষ সম্পূর্ণ সক্ষম। সুতরাং প্রথম যুগের মুসলমানদের জীবনে সুউচ্চ নৈতিক আদর্শের কথা স্মরণ রেখে আমরা যদি ইসলামকে আধুনিক জীবনে প্রয়োগ করতে চাই, তাহলে আমাদেরও যে সে যুগের মত অলৌকিক তড়িৎ-গতিতেই অগ্রসর হতে হবে তার কোন মানে নেই। কারণ বিভিন্ন দিকে মানুষের লব্ধ বিপুল অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি আমাদেরকে ইসলামী আদর্শের সুউচ্চ শিখরের অনেকটা নিকটবর্তী করে তুলেছে। ফলে এর বাস্তবায়ন এখন অনেক সহজতর হয়ে উঠেছে এবং এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমও সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক জীবনধারা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

আধুনিক যুগের অধিকাংশ জাতি সাধারণ নির্বাচনের মারফত তাদের শাসক নির্বাচিত করে থাকে। জনসাধারণের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে তারা ব্যর্থ হলে জনগণ তাদের সাস্পেণ্ড বা ডিস্মিস্‌ও করতে পারে। কিন্তু তেরশ' বছর পূর্বে ইসলাম যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল, এটা তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের আধুনিক প্রয়োগবিধি মাত্র। খলীফা আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর যুগে এটা অবশ্যই অলৌকিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু আমাদের আধুনিক বিশ্বে এটা তা নয়। আমরা যদি আমাদের জীবনে এটা সততার সাথে কার্যকর করতে চাই তবে এর বাস্তবায়ন আমাদের জন্য অতি সহজ। আমরা যদি এটা ইংলণ্ড বা আমেরিকা থেকে নিতে পারি তবে ইসলামের নামে কেন গ্রহণ করতে পারব না—বিশেষত এটা যখন ইসলামের মধ্যে এমনিতেই রয়ে গেছে ?

তারপর রাষ্ট্র কর্তৃক তার কর্মচারীদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের প্রশ্ন। এ ব্যাপারেও রসূলে করীম (সা)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিংশ শতাব্দীতে কমিউনিজম এই বিধানটি কার্যকরী করেছে; কিন্তু এটা ইসলাম পূর্বেই কার্যকরী করতে সক্ষম হয়েছিল—অথচ কমিউনিজম প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কায়েম না করে উক্ত বিধান কার্যকর করতে পারেনি। রাষ্ট্রের কর্মচারীদের জন্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান যদি আমরা করতে চাই তার জন্য আমরা ইসলামের নেতৃত্ব অনুসরণ না করে কমিউনিজমকে অনুসরণ করতে যাব কেন ?

সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমরা যে সমস্যাটির সম্মুখীন হচ্ছি তার মধ্যে রয়েছে একটি মৌলিক প্রশ্ন। কোন বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব কি না? এটাই একমাত্র মাপকাঠি, যার ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থার বাস্তবতা বা অবাস্তবতার বিচার হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে একটি বাস্তব জীবন-ব্যবস্থা। কারণ, পৃথিবীর বুকে এটাই সর্বপ্রথম ব্যবস্থা, যা মানব-জীবনে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

কমিউনিস্ট ও তাদের স্বগোত্রীয়রা বলে বেড়ায় যে, আধুনিক জীবন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর ইসলাম ভাবাবেগ ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা—একথার মূলেও কোন সত্য নেই। এটা যে নির্জলা মিথ্যা তা একটা বিষয় থেকেই বোঝা যায়—ইসলামী আইন মোটেই মানুষের অনুভূতি বা ভাবাবেগের উপর নির্ভর করে না। অনুরূপভাবে প্রথম যুগের খলীফাগণ তাঁদের পরিষদের সঙ্গে পরামর্শকালে অথবা আইনের ব্যাখ্যা ও ইসলামী আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে কল্পনাবিলাস বা মানুষের মর্জির উপর তাঁদের সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিতেন না।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ইসলাম শুধু আইনের উপর নির্ভর করে না। তা অবশ্যই নানারূপ আইন রচনা করে, কিন্তু সর্বপ্রথমে এটা চায় মানুষকে ভেতর থেকে সভ্য করে তুলতে। কারণ তার দ্বারাই আইন প্রয়োগ করা হলে তারা তাকে স্বেচ্ছায় মেনে চলবে—শুধুমাত্র সরকারের বাহ্যিক ভয়ে নয়, নিজের মধ্যকার নৈতিক তাগিদেও। রাজনীতির জগতে মানুষ এ পর্যন্ত যা কিছু হাসিল করেছে এটা নিঃসন্দেহে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কিন্তু আইন সর্বক্ষণ মওজুদ রয়েছে এবং যখনই সাধারণ কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হয় তা ব্যবহার করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এটা ব্যক্তি ও দল-নির্বিশেষে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়, সে সম্পর্কে খলীফা উসমান (রা) বলেছেন: "কুরআন যা নিয়ন্ত্রণ করে নাই আল্লাহ্ তার নিয়ন্ত্রণ করেন সরকারের মাধ্যমে।"

কতক লেখক ইসলামের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভব নয় তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তি দেন যে, উমরের মত লোক সব সময় জন্মগ্রহণ করেন না; আর অনুরূপ ব্যক্তিত্ব ব্যতিক্রম এবং ইতিহাসে যখন-তখন এরূপ ব্যক্তিত্ব দেখা যায় না। কিন্তু যুক্তির এই ধারা তাদের মস্তিষ্কের শূন্যতাই প্রমাণ করে। কারণ, ইসলামী আইন প্রয়োগের জন্য আজ আমাদের প্রয়োজন ইসলামের প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্র—ব্যক্তিগত উমর নন, বরং তাঁর রচিত আইন ও আইনের নজীর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উমর হুকুম দিয়েছিলেন যে, কেউ যদি কোন বাহ্যিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক চাপের ফলে চুরি করে থাকে বলে প্রমাণ হয় তবে তার হাত কাটা যাবে না। এই আইন বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য নিশ্চয়ই

উমরের মত লোকেরই যে একেবারে প্রয়োজন তা নয়। ইসলামের একটি বিধান রয়েছে যে, সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি দান পরিহার করতে হবে, আর উপরোক্ত বিধানে উমর ইসলামী ব্যবহার-শাস্ত্রের উক্ত মূলনীতিরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র। উমর আমাদের মধ্যে নেই বলেই যে আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা এই নীতি রূপায়িত করতে পারব না, এমন তো কোন বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ বাধা নেই।

অনুরূপভাবে উমর আরও আইন করেছিলেন যে, ধনী লোকদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার অধিকার শাসকের আছে। এ নিয়মটা বর্তমানে ইংলণ্ডেও চালু করা হয়েছে। এটা চালু করতে ইংলণ্ডে একজন উমরের দরকার হয়নি—তাতেই বোঝা যায় আধুনিক বিশ্বে এটা বাস্তবায়নযোগ্য। তাঁর এই আইন ছিল কুরআনেরই একটা আয়াতের ভিত্তিতে রচিত—"সম্পদ যেন কিছুতেই শুধুমাত্র ধনীদের হাতে আবর্তিত না হয়।" (৫৯ : ৭)। উমর আরও বিধান দিয়েছিলেন যে, গভর্নরদের সম্পদ কিভাবে অর্জিত হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখার অধিকার রাষ্ট্রের আছে; রাষ্ট্র খুঁজে খুঁজে দেখবে—সম্পদ কি তাদের নিজেদের, না সরকারী তহবিল হতে তসরুপ করা অথবা অবৈধভাবে অর্জিত। এটা আজকের বিশ্বে প্রায় সার্বজনীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও এই বিশ্বে উমর উপস্থিত নেই। তিনি আরও নিয়ম করেছিলেন যে, পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হবে। কারণ, তার পিতা-মাতার পাপের জন্য তাকে দায়ী করা চলে না অথবা তাকে কষ্ট দেওয়া চলে না। ইউরোপ এবং আমেরিকাও এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়ে আইন তৈরী করেছে। এতে করে আরেকবার প্রমাণিত হল যে, এই আইন প্রয়োগের জন্য উমরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। উমরকে তো আমাদের এজন্যে প্রয়োজন নয় যে তিনি একজন ব্যক্তিত্বশালী লোক ছিলেন বরং এজন্যে যে, তিনি ইসলামের প্রথম যুগের একজন নেতৃস্থানীয় আইনজ্ঞ ছিলেন এবং ইসলামের মর্ম ও শিক্ষার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, তা আমরা অনুসরণ করলে উপকৃত হব। কারণ এতে করে আমরা জীবনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতে অনুপ্রেরণা পাব এবং সর্ব যুগের মুসলমান এ থেকে অনুসরণের জন্য এক মহৎ শিক্ষা লাভ করবে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে আমরা যদি ব্যর্থও হই, তাঁর রচিত আইন পালন করলেও বাস্তব জীবনে আমাদের জন্য যথেষ্ট

হবে। কারণ আমরা এর ফলে অন্যান্য জাতির নিকট থেকে ধার করা আইন ও শাসনতন্ত্রের অন্ধ অনুকরণের বদলে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারব।

এ ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে আর একটি মস্ত ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় ছাড়া আর কোন দিন ইসলাম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একথা সত্য যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর উমর বিন আবদুল আযীযের সংক্ষিপ্ত খিলাফতকাল ব্যতীত আর কখনো ইসলাম প্রকৃত চেহারায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে একথাও ঠিক নয় যে, খিলাফতে রাশেদার পর একটি ধর্ম ও জীবন-পদ্ধতি হিসাবে ইসলামের অস্তিত্ব নেই। পরবর্তী বছরগুলিতে শুধুমাত্র সরকারের মধ্যেই ইসলামের দৃষ্টিতে আংশিক বা পূর্ণ অধঃপতন ঘটেছে। সমাজের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের ন্যায় ইসলামী থেকেছে। এ সমাজ কোন দিন মানুষকে ধনী, নির্ধন অথবা মালিক, গোলাম পর্যায়ে বিভক্ত হতে দেয়নি। তারা বরং একটা সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থেকেছে এবং একে অন্যের সাথে মিলে মিশে কাজ করেছে এবং তার ফল ভোগ করেছে।

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম ভূ-খণ্ডের আইনই প্রাধান্য লাভ করেছে; ইউরোপের মত সামন্ত প্রভুদের দয়ার উপর জনসাধারণকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। ইসলামের ঐতিহ্য বজায় থেকেছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালেও এ ঐতিহ্য মুসলমানরা পালন করেছে। ক্রুসেডের ইতিহাস, বিশেষ করে সালাহ্ উদ্দীন আইউবীর আমলের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। পরবর্তীকালে ও আন্তর্জাতিক চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আচরণ মহান ও গৌরবজনক ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাদের আগ্রহ এবং সভ্যতা সম্পর্কে তাদের অকুন্ঠ শ্রদ্ধার কারণে মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ও শিল্পকলা চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের প্রজ্বলিত জ্ঞানের দীপ্ত মশালই সমগ্র ইউরোপকে আলোকিত করে তাকে প্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

পাশ্চাত্যে যেরূপ খারাপ অর্থে ভাববাদ বোঝানো হয়, ইসলাম সেরূপ কোন মতবাদ নয়। এটা বরং একটা নিখুঁত বাস্তব ব্যবস্থা, যা একবার মানুষ পরখ করে দেখেছে। সুতরাং তেরশ' বছর পূর্বে যে ভাবে একে একবার রূপায়িত করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজেই সেরূপ সাফল্যের সাথে আজও একে রূপায়িত করা সম্ভব। নবলব্ধ অভিজ্ঞতা বরং এর উপলব্ধির পথ মানুষের জন্য আরও সহজ ও নিকটতর করে দিয়েছে। অপর পক্ষে কমিউনিজম সম্পর্কেই বলা চলে যে, এটা একটা কল্পনা-প্রধান আদর্শবাদ,

যার সফল প্রয়োগ এ পর্যন্ত কখনও হয়নি। আমাদের বলা হয়, প্রকৃত কমিউনিজমের স্তর এখন আসেনি, দুনিয়াই নাকি কেবল ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যখন সমগ্র বিশ্বকে একটিমাত্র বিশ্ব কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আওতাধীনে আনয়ন করে এর সমস্ত নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সম-বন্টন করা হবে, তখনই নাকি কমিউনিজমের আসল স্তর-হাসিল করা হবে। তখন বড় ও ছোটর মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রাম চিরতরে দূরীভূত হবে। কারণ, সম্পদের অসম বন্টনই শ্রেণী-সংগ্রামের একমাত্র কারণ।

কমিউনিস্ট স্বপ্নরাজ্য একটি কল্পনা-রাজ্য, যা এই মাটির পৃথিবীতে কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি এবং হবে না। এই মতবাদ যে মনে করে, একইরূপ উৎপাদন-যন্ত্র দিয়ে মানুষকে কখনো কৃত্রিমভাবে সমান করা যাবে না এবং মানুষের মধ্যে সম্পদের সমবন্টন হলেই সব শ্রেণী-সংঘাত খতম হয়ে যাবে এবং মানবতা শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে না—এর সবকটি ধারণাই ভিত্তিহীন ও অসত্য। এ এমন এক ভাববাদের প্রতিনিধিত্ব করে, যা শুধুমাত্র আহম্মকদেরই চিত্ত জয় করতে পারে, জড়বাদের নামে কল্পনার জগতে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিহাসের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক নীতি ও জীবনের সত্যের উপর একে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করা হয়।

# ইসলাম ও যৌন অবদমন

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীরা অভিযোগ করেন যে, ধর্ম মানুষের জীবন-শক্তি অবদমিত করে তার জীবনকে নিষ্প্রাণ করে তোলে। কারণ ধর্মীয় লোকদের মনে এক প্রকার বিশেষ পাপবোধ থাকে, যার ফলে সে পার্থিব সমস্ত ক্রিয়া-কর্মকেই দূষণীয় মনে করে এবং মনে করে জীবনের আনন্দ-উপভোগ থেকে দূরে সরে না থাকাই পাপ। ঐ সব মনোবিজ্ঞানী আরও বলেন যে, ইউরোপ যতদিন ধর্ম মেনে চলত ততদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, কিন্তু যখনই সে ধর্মের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করল, এর ভাবাবেগ মুক্তি পেল এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সে বিস্ময়কর সফলতা লাভ করল।

এ-সব মনোবিজ্ঞানী প্রায়ই বলেন: তোমরা কি আমাদের ধর্মের দিকে ফিরে যেতে বল? আমরা প্রগতিবাদীরা যে জীবন-শক্তি মুক্ত করে দিয়েছি, তাকে কি তোমরা শৃঙ্খলিত করতে বল? কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ এ-সব কথা অষ্টপ্রহর স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমরা কি তরুণদের জীবন বিষিয়ে তুলতে চাও?

ইউরোপীয়রা তাদের ধর্ম সম্পর্কে যা ইচ্ছে বলুক; আমরা সেটা বিশ্বাস করি না করি, তাতেও বড় একটা আসে যায় না। কারণ আমরা সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করছি না: আমরা আলোচনা করছি ইসলাম সম্পর্কে।

ইসলাম জীবন-শক্তি অবদমন করে কিনা, এটা আলোচনা করার পূর্বে 'অবদমন' কথাটার ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। 'কালচার্ড' এবং 'অর্ধ-শিক্ষিত' উভয় দলই এই শব্দটির অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ করেছেন।

মৌলিক প্রবৃত্তিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার ফল অবদমন নয়। প্রবৃত্তি-জাত কাজকে নোংরা বলে বিশ্বাস করা এবং এরূপ কোন তাগিদ যে মানুষের মন ও চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে, তার অস্বীকৃতি থেকেই অবদমনের উদ্ভব হয়। এই অর্থে অবদমন হচ্ছে অবচেতন অনুভূতি এবং প্রবৃত্তিজাত কাজটি সম্পাদন করেও হয়ত তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিজাত কাজ সম্পাদন করে অথচ মনে করে যে, সে একটি খারাপ ও নোংরা কাজ করছে, সে যদি দিনে বিশ বারও সে কাজটি করে তবুও সে অবদমন রোগ

থেকে মুক্তি পায় না। প্রতিবার এরূপ কাজ করেই—কী সে করেছে এবং কী তার করা উচিত ছিল—এদুইয়ের মধ্যে একটা মানসিক সংঘাতে সে ভুগবে। সচেতন ও অবচেতন মনের এই যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত—এ থেকেই জটিলতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

অবদমনের এই সংজ্ঞা বর্তমান লেখক আবিষ্কার করেন নি। এই সংজ্ঞা দিয়েছেন ফ্রয়েড, যিনি আজীবন ধর্মকে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, ধর্ম মানুষের ক্রিয়াকলাপ দমন করে। ফ্রয়েড তাঁর 'থ্রি কন্ট্রিবিউশনস টু সেক্সুয়াল থিয়োরী' নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৮২) বলেন যে, "অবচেতন, অবদমন ও প্রবৃত্তিজাত কাজ থেকে বিরত থাকা—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজন আছে, কারণ এটি তো কাজ সাময়িকভাবে বাদ রাখা।"

এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রবৃত্তিসঞ্জাত কাজ সম্পাদন থেকে সাময়িক-ভাবে বিরত থাকা নয়, এই কাজকে নোংরা মনে করা থেকেই অবদমনের উৎপত্তি। এবারে অবদমন ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

প্রাকৃতিক তাগিদ স্বীকার করে নেওয়া এবং তাকে পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ বিষয় বলে বিবেচনা করার ব্যাপারে ইসলামের মত আর কোন ধর্মই অত অকপট নয়। পবিত্র কুরআন বলেঃ

> স্ত্রীলোক, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, তেজী ঘোড়া, গৃহপালিত জন্তু কর্ষণযোগ্য জমি—এ সবকেই মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে দেওয়া হয়েছে। (৩ : ১৪)

এই আয়াতে কুরআন পার্থিব কামনা-বাসনাকে বাস্তব বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এগুলোকে মানুষের চোখে আকর্ষণীয় বলে ঘোষণা করেছে। এই সব কামনাকে আপত্তিকর বলেনি, এগুলোকে নিরুৎসাহিতও করেনি।

এ-কথা সত্য যে, ইসলাম মানুষকে এই সব কামনার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বা এগুলোর গোলামে পরিণত হতে অনুমতি দেয় না। প্রত্যেকেই যদি তার প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে যায়, তবে জীবন ভুল পথে এগিয়ে যাবে। মানবতা উন্নতি ও প্রগতি কামনা করে, বেপরোয়া প্রবৃত্তির পাল্লায় পড়ে মানুষ যদি তার সমস্ত শক্তির অপচয় করে ফেলে ও পশুত্বের স্তরে নেমে যায়, তাহলে মানবতা কোনদিনই তার উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না।

ইসলাম কোন দিনই মানুষকে পশুত্বের স্তরে নেমে যাবার অনুমতি দেয় না। কিন্তু এর সাথে অবচেতন অবদমনের পার্থক্য রয়েছে; কারণ ওতে মনে করা

হয়, এই সব প্রবৃত্তি মাত্রই নোংরা এবং পবিত্রতা ও শুদ্ধির নামে এমন কি ঐ সব চিন্তা থেকেও মানুষকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করা হয়।

মানবাত্মার বিচারে ইসলাম নীতিগতভাবে সমস্ত স্বাভাবিক আবেগকে স্বীকার করে নেয় এবং সেগুলো দমন করে অবচেতন স্তরে আটকিয়ে রাখে না। ইসলাম এই সব প্রবৃত্তিমূলক কাজ এমন পর্যায় পর্যন্ত সম্পাদনের অনুমতি দেয়, যাতে ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতি না করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ আনন্দ বিধান করতে পারে। যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির তাগিদ পূরণেই নিজেকে ব্যস্ত রাখে, সে অচিরেই তার জীবনী-শক্তি নিঃশেষিত করে ফেলে। তাছাড়া, যে ব্যক্তি তার বেপরোয়া প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে যায়, সে কিছু করবার উপযুক্ত থাকে না। তার সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তা তার কামনা পূরণেই নিয়োজিত থাকে।

অনুরূপভাবে, স্রষ্টার পরিকল্পিত বিভিন্ন দিকের পরিবর্তে কোন সমাজের সদস্যগণ যদি একদিকেই তাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করে, তবে তাতেও সমাজের বিরাট ক্ষতি হয়। কারণ এতে জীবনের অন্যান্য বহু দিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেগুলোর মূল্যও কোন অংশে কম নয়। এর ফলে পারিবারিক সংহতি ধ্বংস এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলাও ত্বরান্বিত হয়:

"তুমি হয়ত মনে করবে তারা সুসংহত রয়েছে। কিন্তু আদপে তাদের অন্তরসমূহ দ্বিধাবিভক্ত।"

এমতাবস্থায় অন্যান্যদের পক্ষে তাদের আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়া সহজ হয়। ফ্রান্সে ঠিক এমনটিই ঘটেছিল।

ব্যক্তি যাতে তার নিজের প্রতি, অন্যান্যদের প্রতি, পরিবার বা সমাজের প্রতি কোন ক্ষতি না করে বসে, এ-রকম সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার পর ইসলাম তাকে জীবনের আনন্দ-সামগ্রী উপভোগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলাম জীবনের আনন্দ উপভোগ করতেই আহ্বান জানায়। কুরআন বলে: "আল্লাহ্ যে সব নিয়ামত তাঁর বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবন-ধারণের যে সব বৈধ ও পবিত্র সামগ্রী দান করেছেন, এগুলো কে নিষিদ্ধ করেছে?" কুরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে:

"দুনিয়ায় তোমাদের যে হিস্যা রয়েছে তা অবহেলা করো না"; "তোমাদের জন্য যে সব উত্তম বস্তু দিয়েছি সে সব ভক্ষণ কর"; "খাও এবং পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।"

ইসলাম মানুষের যৌন-প্রয়োজনকে এমন অকপট স্বীকৃতি দিয়েছে যে, রসূল (সা) স্বয়ং বলেছেন:

দুনিয়ার বিভিন্ন ভোগসামগ্রীর মধ্যে সুগন্ধি ও নারী আমার কাছে প্রিয় এবং সালাত আমার চোখের শান্তি।

নারীসংসর্গকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ খোশবুর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং তাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে যাওয়ার সর্বোত্তম কার্য সালাতের সাথে একবাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

রসূল (সা) একবার বলেছিলেন: "মানুষ তার স্ত্রীর সান্নিধ্যে অধিবাসের জন্যেও পুরস্কার পাবে।" যখন বিস্মিত হয়ে কতিপয় শ্রোতা জিজ্ঞেস করলেন: "সেই মানুষটি তার প্রবৃত্তির সন্তোষ বিধানের জন্যে পুরস্কার পাবে?" রসূল (সা) বললেন, "সে যদি এটা নিষিদ্ধ পথে করত তবে যে তার পাপ হত তা কি জান না? অতএব সে যদি এটা হালাল পথে করে থাকে, তবে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে।" (মুসলিম)

এ জন্যেই ইসলামের বিধানে অবদমন কখনও স্থান পায় না। যদি তরুণরা যৌন প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করে তাতে অন্যায় কিছুই নেই এবং যৌন প্রবৃত্তিকে নোংরা ও আপত্তিকর বলে ভাববারও কোন কারণ নেই।

ইসলাম তরুণদের কাছ থেকে যা দাবী করে সেটা হল অবদমন না করে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত প্রয়োজন পূরণ স্থগিত রাখা। ফ্রয়েডের মতে যৌনক্রিয়া স্থগিত রাখার নাম অবদমন নয়। অবদমনের ন্যায় যৌনকর্মের অস্থায়ী বিরতি স্নায়ুর উপর তেমন চাপ সৃষ্টি করে না, এতে জটিলতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশৃংখলাও সৃষ্টি হয় না।

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের এই আহ্বান জনগণকে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার কোন খামখেয়ালী ফরমায়েশ নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোন জাতি তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম না হয়ে বা কোন বৈধ আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বিরত না থেকে তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না। অপরদিকে কোন জাতির জনসমষ্টি কষ্ট সহ্য করতে শিক্ষা না পেলে এবং তাদের কামনা-বাসনা পূরণ প্রয়োজন অনুসারে ঘন্টা, দিন বা বছর পর্যন্ত স্থগিত রাখতে না পারলে সেই জাতি কিছুতেই আন্তর্জাতিক সংঘাতের মুকাবিলা করতে পারে না।

এখানেই ইসলামের সিয়াম সাধনার মাহাত্ম্য। উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রিয় কিছু লোক সিয়াম সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বলেঃ দেহকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট দিয়ে মানুষকে খাদ্য, পানীয় ও জীবনের অন্যান্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখবার কী মানে আছে? এর উদ্দেশ্য কি? বিজ্ঞতা বা যুক্তিযুক্ত লক্ষ্য বিবর্জিত কতকগুলো খামখেয়ালী বিধান মানা ছাড়া এ আর কি?

এই সব উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রিয় লোকদের প্রতি আমরা বলবঃ যে নিজের সংযম-শক্তি প্রয়োগ করে না, সে আবার মানুষ কিসের? কয়েক ঘন্টা যে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ বন্ধ রাখতে পারে না, সে মানবতার কি কল্যাণ করবে? দুনিয়ার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে নিজেদেরকে বহু আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার মত ধৈর্য আমরা কি করে অবলম্বন করতে পারব?

মুসলিম প্রাচ্যের কমিউনিস্ট প্রচারকরা সিয়াম এবং অন্যান্য আত্মসংযম ক্রিয়াকে উপহাস করে। কিন্তু দেহমনকে কষ্ট দিয়ে প্রচুর কঠোরতা সহ্য করবার অভ্যাস না করলে স্ট্যালিনগ্রাডে কমিউনিস্টরা কি করে নাজী আক্রমণ প্রতিহত করতে পারত? এটা আশ্চর্য যে, কমিউনিস্টরা 'রাষ্ট্রের' হুকুমে আত্ম-সংযম অবলম্বন করতে রাযী থাকে, কারণ সেখানে আশু শাস্তির ভয় থাকে, অথচ রাষ্ট্র এবং সমস্ত প্রাণী জগতের স্রষ্টা আল্লাহ্‌র বিধানে অনুরূপ দাবীর কথা শুনলেই চীৎকার শুরু করে দেয়।

একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে, যারা ধর্মের বিধান মেনে চলে, তাদের জীবন বিষময় হয়ে দাঁড়ায় এবং পাপের ভূত তাদের সদা-সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে এ কথা খাটে না, কারণ ইসলামে শাস্তির কথা যত বলা হয়েছে, তার চাইতেও অনেক বেশী বলা হয়েছে ক্ষমার কথা।

ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ এমন কোন দেও-দানব নয়, যা অষ্টপ্রহর মানুষকে তাড়া করে ফিরছে বা অন্ধকারের এমন সাগর নয়, যা মানুষকে সর্বক্ষণ নিমজ্জিত রাখে। আদমের গুনাহ গোটা মানবজাতির দিকে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে নেই, নতুন করে এর কোন শুদ্ধিকরণ বা ক্ষতিপূরণও আর লাগবে নাঃ

> অতঃপর আদম তার প্রভুর নিকট থেকে প্রেরণাদায়িনী বাণী শিক্ষা করল এবং প্রভু তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (কুরআন ২ঃ৩৭)

খুব সহজভাবেই এবং আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আদমের তওবা গ্রহণ করা হয়েছিল।

বাবা আদমের মতই আদমের বংশধররাও গুনাহ করলে আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয় না। আল্লাহ্‌ তাদের প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা জানেন এবং তিনি

কখনো তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না" (কুরআন ২ : ২৮৬)। রসূল (সা) বলেন, "প্রতিটি আদমসন্তানই পাপ করে। এই সব পাপীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা অনুতপ্ত হয়।"

আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও অনুতাপ-সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত অসংখ্য, তবে আমরা এখানে নিম্নোক্ত আয়াতটির উদ্ধৃতিই যথেষ্ট মনে করি:

তোমার প্রভুর নিকট থেকে ক্ষমা গ্রহণের প্রতিযোগিতায় এবং সেই আনন্দধামের জন্যে দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রসার আসমান-জমিনের মত এবং যা তৈরী হয়েছে সৎ লোকদের জন্যে—যারা সম্পদে-বিপদে মুক্ত হস্তে দান করে: যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং সকল মানুষকে ক্ষমা প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ ভালবাসেন তাদের, যারা সৎকাজ করে এবং যারা লজ্জাকর কাজ করে ফেলার পর অথবা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করার পর আল্লাহ্‌কে একান্তভাবে স্মরণ করে এবং পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং জানা অবস্থায় সেই অন্যায়ে লিপ্ত থাকে না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারে?

তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তি এবং স্রোতস্বিনী-পরিবেষ্টিত উদ্যান অনন্তধামই এরূপ প্রতিদান। যারা চেষ্টা করে তাদের জন্যে কত মহৎ এই প্রতিদান। (৩ : ১৩৩-১৩৬)

আল্লাহ্‌র রহমত কত বিশাল ও ব্যাপক! তিনি শুধু বান্দার তওবা কবুল করেন তা'ই নয়, তাদেরকে তিনি পাপ থেকে মুক্তি দেন, তাদের গ্রহণ করেন এবং করুণাধারায় অভিষিক্ত করে সৎ ব্যক্তিদের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

এরূপ দয়ার পর আল্লাহ্‌র ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা উচিত? যখন আন্তরিকতার সাথে 'তওবা' করলেই তিনি তাদের কোলে টেনে নেন, তখন জুলুম ও পাপের জুজু কি করে মানব-আত্মাকে পীড়িত করবে?

আমাদের যুক্তির সমর্থনে আর কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। তবুও আমরা রসূল (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি উদ্ধৃত করতে চাই:

আমার আত্মা যাঁর হাতে রয়েছে তাঁর শপথ, তোমরা যদি কোন পাপকার্য না করতে, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের অপসারিত করে অন্যদের পাঠাতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইত এবং তাদের সেই ক্ষমা মঞ্জুর করা হত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে; এটা আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা যে, তিনি মানুষের পাপ ক্ষমা করবেন। পরিশেষে আমরা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করছি:

> তোমরা যদি কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের শাস্তি দান করে আল্লাহ্‌র লাভ কি? আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। (৪:১৪৭)

হ্যাঁ, আল্লাহ্ যখন তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রদর্শন করা পছন্দ করেন, তখন মানুষকে যাতনা দিয়ে তাঁর লাভ কি?

# ইসলামের শাস্তি-নীতি

কতক লোক প্রায়ই বলে থাকেন, "বহু যুগ পূর্বে মরুভূমির বুকে যে বর্বর শাস্তিদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, আজকের যুগে কি আমরা আবার সেই বর্বর ব্যবস্থা প্রবর্তন করব? পাঁচ পয়সার জন্য একটি চোরের হাত কেটে ফেলা কি সমর্থনযোগ্য? বিংশ শতাব্দীতে আজ যখন মনে করা হয় অপরাধী সমাজের শিকার মাত্র এবং শাস্তির বদলে তার চিকিৎসা পাওয়ারই অধিকার রয়েছে—ঐসব ব্যাপার তখন কি করে ঘটতে পারে?" তাদেরকে একটি মাত্র প্রশ্নই করা যেতে পারে—বিংশ শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকার চল্লিশ হাজার নিরীহ নির্দোষ মানুষ হত্যার অনুমতি দেওয়া চলে আর একটি অপরাধীর বৈধ শাস্তিতে আপত্তি করা হয়—এটাই বা কেমন কথা।

প্রতারণামূলক কথা দিয়ে সত্যকে যারা চাপা দিতে প্রয়াস পায়, তাদের জন্য ধিক।

সুতরাং বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আর তার গুণপনার কথা যত কম বলা যায় ততই উত্তম। আমরা এখন ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ ও শাস্তির ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব।

সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন কার্যকেই সাধারণত অপরাধ বলা হয়ে থাকে এবং এ কারণেই অপরাধ ও ধারণা সংশ্লিষ্ট জাতির ব্যক্তি সমাজ সম্পর্কের ধারণার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় বিভিন্ন ব্যক্তিতান্ত্রিক দেশ ব্যক্তিকে অতি মাত্রায় পবিত্র বিবেচনা করা হয়। সেখানে তাকেই সমগ্র সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়। এসব দেশে ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অধিকার চরমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কিত তাদের ধারণার মধ্যেও এই মনোভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তারা অপরাধীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ও সদয় ব্যবহার করে। কারণ মনে করা হয়, যে-সব দূষিত পরিবেশ, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা তারা কাটিয়ে উঠতে অসমর্থ হয়, তারা সেগুলোরই শিকারে পরিণত হয়। সুতরাং এসব রাষ্ট্র শাস্তি লাঘবেরই পক্ষপাতী। ফলে নৈতিক অপরাধের জন্য তারা যে শাস্তি দেয় তাকে আর যা-ই হোক শাস্তি বলা যায় না।

এ পর্যায়ে অপরাধের হেতু-নির্দেশ ও বিশ্লেষণের জন্য মনঃসমীক্ষণের আবির্ভাব ঘটে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অপরাধ সম্পর্কে মানুষের মনোভাবে ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ফ্রয়েড। তিনি মনে করতেন, অপরাধী ব্যক্তি যৌন-জটিলতারই শিকার, আর সমাজ, ধর্ম নৈতিকতা ও ঐতিহ্য কর্তৃক মানুষের যৌন-প্রবৃত্তি অবদমিত হবার ফলেই এই যৌন জটিলতার উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালে মনঃসমীক্ষণবিদদের সকল দলই ফ্রয়েডের দৃষ্টান্ত মোটামুটি অনুসরণ করেন, তবে তাঁদের অনেকেই তাঁর একথা মেনে নেন নি যে, যৌন-প্রবৃত্তিই মানব-জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এসব মনোবিজ্ঞানীরই ধারণা অপরাধী একটি নিষ্ক্রিয় প্রাণী এবং সে যে সাধারণ ও বিশেষ পরিবেশে লালিত পালিত হয় তারই শিকারে পরিণত হয়। তারা এমন একটি মতবাদে বিশ্বাসী যাকে বলা যায় "মনস্তাত্ত্বিক নিশ্চয়তাবাদ"—যার অর্থ হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক শক্তি পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় কাজ করে চলে, আর এই মনস্তাত্ত্বিক শক্তির ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা বা কর্মের কোন স্বাধীনতা নেই।

অপর পক্ষে, কম্যুনিস্ট দেশসমূহ মনে করে যে, সমাজ হচ্ছে একটি পবিত্র সত্তা এবং কোন ব্যক্তিই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবে না। এজন্যই এসব রাষ্ট্রে যারা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের মৃত্যুদণ্ড ও নির্যাতনসহ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা অপরাধের কারণ হিসাবে মনঃস্তাত্ত্বিক কারণের উপর জোর দিয়েছেন আর কম্যুনিজম মনে করে যে, যে-সমাজে অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান সেখানে মানবীয় গুণের বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কম্যুনিস্টরা কি বলতে পারেন, যে রাশিয়ায় দীর্ঘ দিন ধরে সাম্যবাদী অর্থনীতি চালু রয়েছে, সেখানে আজও কেন অপরাধ সংঘটিত হয়? সেখানে কারাগার ও বিচারালয়ের অস্তিত্ব আজও কেন দেখা যায়?

এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিবাদী ও কম্যুনিস্টদের ধারণা আংশিক-ভাবে সত্য। একথা সত্য যে, একটি ব্যক্তি যে পরিবেশে অবস্থান করে তা তার মানস-গঠনে প্রভাব বিস্তার করে এবং অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ায়ও অনেক সময় অপরাধ সংঘটিত হয়। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতির মুকাবিলায় মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বা অসহায় নয়। মনঃসমীক্ষণবিদগণ যে ভুল করেন তা হচ্ছে:

তারা মানুষের মধ্যকার গতিশীল শক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন অথচ মানুষের অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে অবহেলা করেন। যে-শক্তির বলে একটি শিশু তার ক্ষরণগ্রন্থি ( secretive glands ) নিয়ন্ত্রণ করে বয়সের একটি বিশেষ পর্যায়ে বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করতে সক্ষম হয়, বড় হলে সেই শক্তিই তার আবেগ ও কর্মকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যাতে করে সে তার বেপরোয়া কামনা ও খেয়াল-খুশির শিকারে পরিণত না হয়।

অপর পক্ষে ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মে অর্থনৈতিক অবস্থাও অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একথা সত্য যে, ক্ষুধা মানুষের মানসিকতা বিপর্যস্ত করে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে তার পক্ষে অপরাধ বা নৈতিকতা-বিরোধী কাজ করে বসাও সম্ভব হয়। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণই মানবীয় আচরণকে প্রভাবিত করে—এ ধরনের কথা বলা অর্ধসত্য মাত্র ; সোভিয়েত ইউনিয়নে যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়, সেখানকার বাস্তব অবস্থাই উপরোক্ত তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করে।

আসল প্রশ্ন হল : কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হবে কি হবে না, তা ঠিক করার পূর্বে আমাদের বিচার করতে হবে যে, সে ব্যক্তি যে অপরাধ করেছে তাতে তার দায়িত্ব কতখানি! লক্ষণীয় যে, অপরাধ ও শাস্তির প্রশ্ন বিবেচনা করতে যেয়ে এসব বিষয়ই প্রথম বিচার-বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইসলাম কখনো এলোমেলোভাবে শাস্তি নির্ধারণ করে না এবং যথোপযুক্ত বিবেচনা ছাড়া তা কার্যকরীও করে না। এ বিষয়ে ইসলাম একটি অনন্য তত্ত্ব দেয়, যার মধ্যে কম্যুনিস্ট ও ব্যক্তিতান্ত্রিক উভয় মতবাদের ভাল দিকের সমাহার দেখতে পাওয়া যায়। ইসলাম সঠিক পদ্ধতিতে বিচারের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনা ও সমগ্র পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার উপর জোর দেয়। কোন অপরাধ বিশ্লেষণকালে ইসলাম অপরাধী এবং যে সমাজের বিরুদ্ধে সে অপরাধ করেছে—এ উভয়ের অভিমতকে বিবেচনা করে থাকে। এসব বিবেচনার আলোকে এমন সুচিন্তিত শাস্তির ব্যবস্থা দেয়, যার মধ্যে সুস্থ যুক্তি ও সুবিজ্ঞ বিবেচনা থাকে এবং যা একপেশে তত্ত্ব এবং সমাজ ও ব্যক্তির খেয়াল খুশীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

ইসলাম নিবর্তনমূলক শাস্তির বিধান দেয়। ইহা হাল্কা দৃষ্টিতে বা ভাসা-ভাসা চিন্তার দ্বারা বিবেচনা করলে নির্মম বা কঠোর মনে হতে পারে ; কিন্তু,

অপরাধটি কোনক্রমেই সঙ্গত ছিল না বা অপরাধী বাধ্য হয়ে এ অপরাধ করেনি— এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে ইসলাম কখনো শাস্তি কার্যকর করে না।

ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, চোরের হাত কাটতে হবে, কিন্তু যেখানে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে যে চোর ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করেছিল, সেখানে কিছুতেই এ শাস্তি দেওয়া হয় না।

ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়কে প্রস্তরাঘাত করতে হবে। কিন্তু তারা বিবাহিত ব্যক্তি না হলে এবং চারজন স্বচক্ষে-দেখা সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত এ শাস্তি দেওয়া যায় না। অর্থাৎ একটি বিবাহিত ব্যক্তি ও একটি বিবাহিত স্ত্রীলোকের মধ্যে যখন এই জঘন্য কার্য সংঘটিত হয় তখনই তাদের এরূপ সাজা দেওয়া হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের যত রকম শাস্তির বিধান রয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমনি ধরনের সাবধানতা রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনপ্রণেতা রূপে স্বীকৃত দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কর্তৃক বিধিবদ্ধ একটি আইন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শরীয়তের আইন কার্যকরীকরণে উমরের কঠোরতার কথা সুবিদিত; সুতরাং একথা কিছুতেই বলা চলবে না যে, তিনি আইনের ব্যাখ্যায় কোনরূপ উদারতা দেখিয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে, দুর্ভিক্ষের সময় যখন সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকত যে লোকে ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করতে পারে, উমর কিছুতেই চোরের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি (হাত কাটা) কার্যকর করতেন না।

নিম্নোক্ত ঘটনায় উপরোক্ত আইনের সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে:

"উমরের কাছে এই মর্মে একটি অভিযোগ আনীত হয় যে, হাতিব ইবনে আবি বালতার অধীনস্থ কতিপয় বালক-ভৃত্য মুজনা গোত্রের এক ব্যক্তির একটি উষ্ট্রী চুরি করেছে। উমর যখন তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা চুরির কথা স্বীকার করল। তিনি প্রথমে তাদের হাত কাটার হুকুম দিলেন। একটু পরেই তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যদি না জানতাম যে তুমি এই ছেলেদের দ্বারা কাজ করাও অথচ তাদের ক্ষুধার্ত রাখ, তাহলে তাদের অবশ্যই হাত কাটতাম। কিন্তু অনাহারে থাকবার দরুন তাদের জন্য সেই খাবারও জায়েয, যা স্বাভাবিক-ভাবে তাদের জন্য নাজায়েয'। অতঃপর তিনি উপরোক্ত মালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'আল্লাহ্‌র শপথ, যেহেতু আমি তাদের হাত কাটি নাই, তোমাকে এমন

দণ্ডে দণ্ডিত করব, যা তোমার জন্য দুঃখের কারণ হবে।' একথা বলে তিনি তাকে উষ্ট্রীটির দ্বিগুণ মূল্য জরিমানা প্রদানের আদেশ দিলেন।

এই ঘটনায় একটি দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট নীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় : যেখানে অপরাধী পরিস্থিতির চাপে অপরাধ করে সেখানে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। রসূল (সা)-এর একটি হাদীস থেকে এই নীতির সমর্থন মেলে : "সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শাস্তিদান থেকে বিরত থাক।"

শাস্তি নির্ধারণের বেলায় আমরা যদি ইসলামের অনুসৃত নীতি বিশ্লেষণ করি তবে বুঝতে পারব যে, যেসব পরিস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হয় তা থেকে সমাজকে পরিশুদ্ধ করার জন্যই প্রথমত ইসলামের প্রচেষ্টা। এরূপ সাবধানতা অবলম্বনের পর ইসলাম প্রতিরোধমূলক ও ইনসাফসম্মত শাস্তির ব্যবস্থা দেয় ; এবং তা সেই সমস্ত অপরাধীদের জন্যই, যাদের অপরাধের কোন সুসঙ্গত যুক্তি নেই। যেখানে সমাজ অপরাধ-সৃষ্টিকারী পরিবেশ দূর করতে না পারে অথবা যেখানে অপরাধ সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ আছে সেখানে শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং শাসক অপরাধীকে মুক্তি দেবেন অথবা অপরাধ সংঘটনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্বের অনুপাতে লঘু শাস্তি ( প্রহার বা কারাদণ্ড ) দেবেন।

যে সমস্ত পরিস্থিতি মানুষকে অপরাধের দিকে প্ররোচিত করে বিভিন্ন পন্থায় তা দূর করতে ইসলাম প্রয়াস পায়। ইহা সম্পদের ইনসাফসম্মত বন্টন সুনিশ্চিত করতে প্রয়াস পায়। উমর বিন আবদুল আযীযের খিলাফত কালে ইসলাম দারিদ্র্যের মূল উৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছিল। জাতি-ধর্ম বর্ণ-ভাষা ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের রুটি-রুজীর জন্য দায়ী। সমস্ত নাগরিকের সম্মানজনক কাজের নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্বও রাষ্ট্রের। কাজ যোগানো যখন সম্ভব হবে না অথবা কোন ব্যক্তি যখন কাজ করতে অপারগ হবে, তাকে সাধারণ কোষাগার ( বায়তুলমাল ) থেকে সাহায্য দেওয়া হবে।

ইসলাম লুন্ঠনের সম্ভাব্য সকল রকম প্ররোচনা দূর করতে চেষ্টা করে, তবুও শাস্তি কার্যকরীকরণের পূর্বে সমস্ত পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করে যে, অপরাধ করার মূলে অপরাধীর পেছনে যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল কিনা।

ইসলাম যৌন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক গুরুত্বকে স্বীকার করে নেয় এবং যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্য বৈধ পন্থা তথা বিবাহেরও বিধান দেয়। এ কারণেই ইসলাম যথাশীঘ্র বিবাহের পক্ষপাতী। যারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক অথচ

প্রয়োজনীয় সামর্থ্য যাদের নেই, ইসলাম তাদের জন্য বায়তুলমাল থেকে সাহায্য দানের বিধান দেয়। অপর পক্ষে যে সমস্ত প্ররোচনামূলক কারণ যৌন-কামনাকে উত্তেজিত করে তোলে, ইসলাম সমাজ থেকে সেগুলোর মূলোৎপাটন করতে প্রয়াস পায়। তাছাড়া ইহা মানুষের সামনে এমন সব মহৎ ও পবিত্র আদর্শ তুলে ধরে, যা মানুষের অতিরিক্ত প্রাণশক্তি মানব-কল্যাণের সেবামূলক কাজে নিঃশেষিত হবার পথ করে দেয়। অবসর সময় মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট হতে নিকটতর হবার কাজে ব্যয় করুক—এটাই ইসলামের কামনা। এভাবেই ইসলাম অপরাধের সবরকম মনোবৃত্তি উৎসাদনে প্রয়াস পায়। এতসব সত্ত্বেও অপরাধী সর্বপ্রকার ভব্যতার মাথায় পদাঘাত করে চারজন লোকের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ব্যভিচার করার মত পাশবিক স্তরে নেমে না গেলে ইসলাম শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়ো করে না।

হয়ত বা বলা হবে—বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা তরুণদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে কঠিন করে তুলেছে, আর এজন্যেই তারা ব্যভিচারের পথে পরিচালিত হয়। একথার মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। কিন্তু ইসলাম পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হলে তরুণ-তরুণীদের অপরাধের পথে পরিচালনার মত উন্মত্ত প্ররোচনা থাকবে না এবং যৌন অশ্লীলতামূলক চলচ্চিত্র পত্রিকা বা সংগীতও থাকবে না। রাস্তা দিয়ে উন্মাদনামূলক প্ররোচনা হেটে বেড়াবে না। মানুষকে বিবাহ থেকে বিরত রাখে—এমন দারিদ্র্যও থাকবে না। তখন এবং শুধুমাত্র তখনই জনসাধারণকে পুণ্যবান হতে আহ্বান জানানো যাবে এবং তারাও পুণ্যবান হতে পারবে। এ রকম পরিস্থিতিতে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া চলবে। কারণ তাদের অপরাধের তখন কোন অজুহাত বা যৌক্তিকতা থাকবে না।

শাস্তি নির্দেশের পূর্বে ইসলাম প্রথমত যে সমস্ত পরিস্থিতি ও মনোবৃত্তি মানুষকে অপরাধের দিকে পরিচালিত করে, সেগুলো পরিশোধনের চেষ্টা করে। এর পরেও কেউ যদি অপরাধ করে আর তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে, তখনও ইসলাম শাস্তি পরিহার করতে চেষ্টা করে। ইসলামের এই ইনসাফমূলক ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে তেমন কোন ব্যবস্থা আছে কি?

অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কীয় ইসলামী ধারণার যথার্থতা কতিপয় ইউরোপীয় ব্যক্তি অনুধাবন করে দেখেন নি বলে তারা ইসলামের শাস্তি-ব্যবস্থাকে বর্বর ও মানব মর্যাদার পক্ষে হানিকর বলে মনে করেন। ইউরোপীয় দেওয়ানী শাস্তির ন্যায় এসব শাস্তিও যত্রতত্র এবং যখন তখন দেওয়া হবে বলে তাদের ভুল ধারণা

রয়েছে। কল্পনার ফানুস উড়িয়ে তারা দেখেন যে, ইসলামী সমাজের দৈনন্দিন কারবারই হচ্ছে চাবুক মারা, হাত কাটা আর পাথর মারা। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ ধরনের প্রতিরোধমূলক শাস্তি দানের খুব কমই প্রয়োজন হত। সুদীর্ঘ চার শত বছরের মধ্যে মাত্র ছয় বার চুরির এরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল—এ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অপরাধ প্রতিরোধ করাই ছিল এসব শাস্তির প্রধান লক্ষ্য।

একথা মনে রাখা উচিত, ইসলাম শাস্তি নির্ধারণের পূর্বে অপরাধ প্রতিরোধেরই প্রয়াস পায়। এমন কি, যেসব ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়াও হয়েছে, আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে তা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দেওয়া হয়েছে।

কতক ইউরোপীয়ান কেন যে ইসলামের বিধান প্রয়োগকে ভয় করেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া ভার। তবে তারা নিজেরা যদি অপরাধী হয়ে থাকেন এবং গায়ের জোরে অপরাধ চালিয়ে যেতেই গোঁ ধরেন তবে স্বতন্ত্র কথা।

অপর পক্ষে কতক লোক কল্পনা করেন যে, এসব শাস্তির কোন বাস্তব তাৎপর্য নেই। ধারণাটি সত্য নয়। এইসব শাস্তি তাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নির্ধারিত হয়েছে, যাদের অপরাধের কোন যুক্তিসংগত কারণ না থাকা সত্ত্বেও অপরাধের প্রবণতা যাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে, তাদের অপরাধের মনো-বৃত্তি যত দৃঢ়ই হোক, শাস্তিদানের ফলে পরবর্তীকালে নতুন অপরাধ করতে যেয়ে তাদের দুবার চিন্তা করে দেখতে হবে।

একথা সত্য যে, কোন কোন তরুণ যৌন অবদমনের অসুবিধায় ভুগছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সমাজ সাধারণের কল্যাণের জন্য, সমস্ত সদস্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাবে, ততদিন সমাজ ব্যক্তি ও সম্পত্তির বিষয়ে পূর্ণ নিরাপত্তার দাবীদার।

অন্যদিকে, যে সমস্ত ব্যক্তি কোন সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই অপরাধ করে তাদেরকেও তাদের নিজেদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। এ সমস্ত লোক যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মারফতে পুনরায় স্বাভাবিকতার পথে ফিরে আসতে পারে ইসলাম তার জন্যও সম্ভাব্য সকল পন্থায় চেষ্টা চালায়।

এটা দুঃখজনক যে, কতিপয় শিক্ষিত তরুণ ও আধুনিক আইনজ্ঞ শুধুমাত্র এই আশংকায় ইসলামের শাস্তিব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন যে, ইউরোপীয়রা তাদেরকে বর্বর বলবে। কিন্তু আমি সুনিশ্চিত যে, এঁরা যদি ইসলামী আইনের যথার্থতা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন, তবে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হবেন।

# ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তার স্বাধীনতা ও সভ্যতা

## ইসলাম ও চিন্তার স্বাধীনতা

আলোচনার এক স্তরে আমাকে ভদ্রলোক বলে বসলেন—"আপনি উদারপন্থী নন্।"

—"কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

—"আপনি কি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

—"হ্যাঁ, করি।"

—"তাহলে আপনি উদারপন্থী নন।"

আমি প্রশ্ন করলাম—"আপনি কি জন্য বলছেন যে আমি মুক্তবুদ্ধি নই?"

—"কারণ আপনি এমন এক ননসেন্সে বিশ্বাস করেন, যার কোনই অস্তিত্ব নেই" তিনি বললেন।

—"আর আপনি? আপনারা কিসে বিশ্বাস করেন? এই বিশ্বজগৎ ও জীবন কে সৃষ্টি করেছে বলে আপনি মনে করেন?"—আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

—"প্রকৃতি!"

—"কিন্তু প্রকৃতি চীজটা কি?"

—"ইহা এমন এক গোপন শক্তি, যা অসীম অথচ যার বহিঃপ্রকাশ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।"—তিনি বললেন।

এবার আমি বললাম: "আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি আপনি আমাকে একটি অজানা শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে নিষেধ করছেন এজন্যে, যাতে অপর একটি সমান অজানা শক্তিকে বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমি আমার আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে সমান অজানা মিথ্যা এক দেবতাকে বিশ্বাস করব কেন? আমি তো আমার আল্লাহ্‌র বিধান থেকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি পেয়ে থাকি; অথচ প্রকৃতি রূপী মিথ্যা দেবতা আমার প্রার্থনারও জবাব দেয় না, আমাকে কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও দিতে পারে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটাই হচ্ছে তথাকথিত প্রগতিপন্থীদের চিন্তার বহর, আর এরাই চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলে বেড়ায়। তাদের মতে চিন্তার স্বাধীনতা অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্‌কে অস্বীকৃতির স্বাধীনতা। এটা চিন্তার স্বাধীনতা নয়—নাস্তিকতার স্বাধীনতা। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা অভিযোগ করে যে, ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতা খর্ব করে, কারণ ইসলাম নাস্তিকতার বিরোধী। কিন্তু প্রশ্ন হল—চিন্তার স্বাধীনতা আর নাস্তিকতার স্বাধীনতা কি এক বস্তু? এবং নাস্তিকতা কি চিন্তার স্বাধীনতার অপরিহার্য পূর্বশর্ত? ইউরোপীয় উদার-নৈতিকতার ইতিহাস দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তারা এই সত্যটি ভুলে যায় যে, কতিপয় স্থানীয় পরিস্থিতির দরুন ইউরোপে যদি নাস্তিকতা প্রসারের প্রয়োজন ঘটেও থাকে, তার অর্থ এই নয় যে দুনিয়ার সর্বত্র সেই একই ব্যাপার ঘটতে হবে।

ইউরোপে চার্চের বিজ্ঞান-বিরোধিতা, বিজ্ঞানীদের উপর অত্যাচার এবং "ঈশ্বরের বাণী" বলে বহু মিথ্যা ও কুসংস্কার চালিয়ে দেওয়ার ফলে খৃস্টধর্মের যে চেহারা ফুটে ওঠে তার ফলে মুক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা নাস্তিকতার দিকে ঢলে পড়ে। ইউরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জন্য দু'টি বিপরীত-ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর একটিকে বেছে নিতে হয়েছিল: ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও বাস্তব বিষয়াবলী।

ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃতির মধ্যে তাদের সমস্যার আংশিক সমাধান খুঁজে পেল। তাই চার্চকে ডেকে তারা বলল: "তোমাদের ভগবান তোমরা ফিরিয়ে নাও, কারণ এরই নামে তোমরা আমাদের দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ কর, আমাদের উপর কঠিন বোঝা চাপিয়ে দাও এবং অত্যাচারমূলক ডিক্টেটরশীপ ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আমাদের আবদ্ধ কর। তোমাদের ভগবানে বিশ্বাস করলে আমাদের মানবসঙ্গ বর্জিত সাধু জীবন যাপন করতে হয়—অতএব তোমাদের নির্দেশ মানতে আমরা রাযী নই। এখন আমরা নতুন এক 'ভগবান' মানুষ, যার মধ্যে তোমাদের ভগবানের অধিকাংশ গুণ রয়েছে, অথচ আমাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবার মত তার কোন চার্চ নেই, আর তোমাদের ভগবানের মত সে নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা বৈষয়িক কোন বিধি-নিষেধও চাপিয়ে দেয় না।"

কিন্তু ইসলামে এমন কিছু নেই, যার জন্য মানুষ নাস্তিকতার আশ্রয় নেবে। মানুষের মন ধাঁধিয়ে দেওয়ার মত কোন জটিলতা এখানে নেই। আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছু তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। এ এমন এক স্বচ্ছ ও সহজ ধারণা যা অস্বীকার বা সন্দেহ করা এমন কি প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিকদের পক্ষেও কষ্টকর।

ইসলামে ইউরোপীয় চার্চের মত কোন যাজকশ্রেণী নেই। ধর্ম সকলের সাধারণ উত্তরাধিকার এবং এর থেকে নিজ নিজ দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি অনুপাতে কল্যাণ লাভের অধিকার প্রতিটি মুসলিমের আছে। সমস্ত মানুষ সমান এবং প্রত্যেককে বাস্তব জীবনে তার কার্যকলাপের মাধ্যমেই বিচার করতে হবে। মানুষের মধ্যে সে-ই সবচাইতে সম্মানী, যে পুণ্যবান, সে ইঞ্জিনিয়ার হোক, অথবা শিক্ষক, শ্রমিক বা শিল্পী হোক। ধর্ম আর দশটা পেশার মত কোন পেশা নয়। ইসলামের ইবাদত করার জন্য পাদ্রীদের মত কোন পেশাদার যাজক গোষ্ঠীর প্রয়োজন হয় না। এমনটি অবশ্য হতে পারে যে কতক লোক নীতি ও আইন-শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করবেন এবং তার দ্বারা সমাজব্যবস্থা উপকৃত হবে। ইসলামী ব্যবহারশাস্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক আইন বিষয়ে যারা এভাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করবেন, তাদের সামাজিক মর্যাদা অন্যান্য দেশের এ ধরনের বিশেষজ্ঞদের চাইতে অধিক হবে না। জনগণের উপর বিশেষ অধিকার অথবা শ্রেণীমর্যাদা তারা পাবে না। তারা আইনজ্ঞ এবং রাষ্ট্রের উপদেষ্টা মাত্র। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় একটি ধর্মীয় সংস্থা, কিন্তু পাশ্চাত্যের পাদ্রীদের মত মানুষদের পুড়িয়ে মারা বা তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর অধিকার এর নেই। আল-আজহার বড়জোর কোন ব্যক্তি ধর্ম সম্পর্কে যা বুঝেছে, তা চ্যালেঞ্জ ও সমালোচনা করতে পারে। পক্ষান্তরে আল-আজহারের বাইরের যে-কোন লোকও এর ধর্মীয় ধারণাকে চ্যালেঞ্জ ও সমালোচনা করতে পারে, কারণ ইসলাম কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির একচেটিয়া নয়। ধর্মীয় প্রশ্নে শুধু সেইসব লোককেই প্রামাণ্য বলে ধরা হয়, যারা তাদের গভীর জ্ঞান-সাধনার আলোকে ইসলামকে বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করে—তাদের ব্যক্তিগত পেশা যাই হোক।

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আলেমগণ (ইসলামী পণ্ডিত) রাতারাতি গভর্নর, মন্ত্রী বা ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা বনে যাবেন না। পরিবর্তন শুধু এই হবে যে, শাসনব্যবস্থার ভিত্তি আল্লাহ্‌র আইন তথা ইসলামের ব্যবহারশাস্ত্রের আলোকে রচিত হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ ইঞ্জিনিয়ারদের উপরই ন্যস্ত থাকবে, চিকিৎসা কার্যের জন্য চিকিৎসকগণই দায়ী থাকবেন। তদ্রূপ অর্থনীতিবিদরাই সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। তবে এক্ষেত্রে পার্থক্য হবে এটা যে, ইসলামী অর্থনীতিই তাদের নীতিনির্দেশনার দায়িত্ব নেবে।

ইসলাম সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের আদর্শ বা এর শাসনব্যবস্থা কোনদিনই বিজ্ঞান বা তার তত্ত্ব প্রয়োগের ব্যাপারে বাধ সাধে নি। ইসলামের ইতিহাসে কোন বিজ্ঞানীকেই কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটনের কারণে কখনো

পুড়িয়ে মারা হয়নি বা তাকে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হয়নি। ইসলামের আদর্শ তথা আল্লাহ্ই যে সবকিছুর স্রষ্টা—এই বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকৃত বিজ্ঞানের কোন সংঘাত নেই। মহাকাল ও পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ও তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনুধাবন করতে ইসলাম মানুষের প্রতি আহ্বান জানায়। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, বহু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী, যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করতেন না, বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস আনয়ন করতে বাধ্য হন।

ইসলামে এমন কিছুই নেই, যা মানুষকে নাস্তিকতার পথে পরিচালিত করতে পারে। প্রাচ্যের নাস্তিক্যবাদের প্রবক্তাগণ তাদের সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভুদের অন্ধ অনুকারী মাত্র। তারা চায় যে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সর্বপ্রকার ইবাদতের সমালোচনা করার স্বাধীনতা দিতে হবে। তারা আবদার জানায় যে, ধর্ম বর্জন করা হোক। কিন্তু তারা এ স্বাধীনতা চায় কেন? ইউরোপে মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল কুসংস্কার থেকে তাদের অন্তরকে মুক্ত করতে এবং শোষণ ও জুলুম থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে কিন্তু যেসব প্রয়োজনে এই স্বাধীনতা তারা চায় বা দাবী করে, ইসলাম যদি এমনিতেই সেগুলো পূরণ করে তবুও তারা একে আক্রমণ করবে কেন? আসল ব্যাপার হল, এই তথাকথিত 'উদারপন্থী'দের চিন্তার স্বাধীনতা নিয়ে অতটা মাথাব্যথা নেই, যতটা রয়েছে নৈতিকতা-বিরোধী কার্যকলাপ ও অবাধ যৌন বিশৃঙ্খলা প্রসারের ব্যাপারে। চিন্তার স্বাধীনতার শ্লোগানটাকে তারা তাদের কুৎসিৎ কামনাটিকে ঢাকার জন্যই মুখোস হিসাবে ব্যবহার করে। ধর্ম ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে তাদের গোপন ষড়যন্ত্রের স্বার্থে এটা একটা ধূম্রজাল মাত্র। ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে—এজন্য তারা ইসলাম-বিরোধী নয়, ইসলাম কুৎসিৎ কামনা থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে চায় বলেই তারা ইসলামের বিরোধী।

এই তথাকথিত 'মুক্ত চিন্তা'-র প্রবক্তাগণ অভিযোগ করে যে, ইসলাম রাষ্ট্রের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেয় বলেই ইসলামী শাসন একনায়কত্বমূলক। তারা আরও বলে, ধর্মের প্রতি জনগণের প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, আর এই ধর্মের নামে ইসলাম রাষ্ট্রকে প্রচুর ক্ষমতা ও অধিকার দেয়, যার ফলে জনগণ অন্ধভাবে নির্যাতনমূলক শাসনের শিকলে বাঁধা পড়ে। তারা মন্তব্য করতে চায়, এর ফলে রাষ্ট্র একনায়কত্বমূলক হয়ে যায়, আর জনগণ গোলাম শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের চিন্তার অধিকার হারিয়ে ফেলে, চিন্তার স্বাধীনতা চিরতরে হারিয়ে যায়। কেউ শাসকদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে না, যে তা করে সেও ধর্ম ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

এই সব খোঁড়া অভিযোগের জবাবে কুরআনের এই আয়াতগুলোই যথেষ্ট : ১. "এবং তাদের সরকার পরিচালিত হয় তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে" (৪২ : ৩৮)। ২. "তোমরা যখন জনসাধারণের কোন বিষয় বিবেচনা কর তা ইনসাফের ভিত্তিতে বিবেচনা করবে।" (৪ : ৫৮)।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) বলেছিলেন : "আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণ করবে যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করি। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ্ অথবা তাঁর রসূলের খেলাফ কাজ করি তখন আমি তোমাদের আনুগত্যের হকদার নই।"

হযরত উমর (রা) মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : "আমার মধ্যে কোন বক্রতা (বা ভ্রান্তি) দেখলে তোমরা আমাকে সোজা করে দিও।" শ্রোতাদের একজন বলেছিলেন : "আপনার মধ্যে যদি কোন বক্রতা আমরা দেখতাম তলোয়ারের সাহায্যে তা আমরা সোজা করে দিতাম।"

একথা সত্য যে, ধর্মের নামে কখনো কখনো জুলুম ও নির্যাতন চালানো হয়েছে। একথাও সত্য যে, কোন কোন দেশে এখনও ধর্মের নামে এরূপ নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কিন্তু ধর্মই কি জালিমদের একমাত্র অস্ত্র? হিটলার কোন্ ধর্মের নামে দেশ শাসন করতেন? রাশিয়াতে পর্যন্ত এখন স্বীকার করা হয়—স্টালিন একজন জালিম ও একনায়কত্ববাদী ছিলেন এবং তিনি রাশিয়ায় পুলিশী রাজ্য কায়েম করেছিলেন। কিন্তু স্টালিন কোন্ ধর্মের নামে দেশ শাসন করেছিলেন? মাও-সেতুং, ফ্রাঙ্কো, দক্ষিণ আফ্রিকার মালান, জাতীয়তাবাদী চীনের চিয়াং কাইশেক প্রভৃতি অসংখ্য জালিম শাসকদের কেউ কি ধর্মের নামে রাজত্ব করেছেন? এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই যে, ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েও বিংশ শতাব্দী বহু দানবীয় ডিক্টেটরশীপ প্রত্যক্ষ করছে এবং এসব ডিক্টেটরশীপ চালানো হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে বা ধর্মের নামে নয়—তার চাইতে বহু আকর্ষণীয় নতুন নতুন নামে।

ডিক্টেটরশীপের সমর্থন কেউই করে না; মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত বিবেকের অধিকারী কোন মানুষ ইহা অনুমোদন করতে পারে না। কিন্তু যে-কোন মহৎ আদর্শকেই তো ব্যক্তিগত স্বার্থের মুখোস হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ফরাসী বিপ্লবের সময় আমরা স্বাধীনতা তথা লিবার্টির নামে জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হতে দেখেছি। কিন্তু এই ঘটনাকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টির অজুহাত হিসাবে খাড়া করতে দেওয়া চলে না। শাসনতন্ত্রের নামে শত শত নিরীহ মানুষকে কারারুদ্ধ, নির্যাতিত অথবা হত্যা করা হয়েছে। এজন্যে কি দুনিয়ার সমস্ত শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে? কোন কোন দেশে ধর্মের নামেও

নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমাদের কি এজন্যে সমস্ত ধর্ম বর্জন করতে হবে? ধর্মে যদি জুলুম ও বেইনসাফীর সপক্ষে ওকালতি থাকত, তাহলে ধর্মকে বর্জন করা ঠিক হত। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তো একথা বলা চলে না। কারণ ইসলামে শুধু মুসলমানে-মুসলমানেই নয়, মুসলমান ও তাদের জাতশত্রুদের মধ্যেও নিখুঁত ইনসাফ ও সাম্যের মহত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন শিক্ষাদানের মাধ্যমেই জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সবচাইতে ভালভাবে সংগ্রাম করা সম্ভব। আর ধর্মই এই স্বাধীনতার সমর্থন ও সংরক্ষণ করে। ধর্মানুসারী লোকেরা কখনো কখনো শাসককে অন্যায়-অবিচারের সুযোগ দেবেন না, বরং তাঁকে তার বৈধ শক্তির পরিসীমার মধ্যে রাখবে। ইসলামের ন্যায় এত কঠোরভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য উৎপীড়ন বিরোধিতায় আর কোন ব্যবস্থা এগিয়ে এসেছে বলে আমার জানা নেই। শাসক অন্যায়কারী হলে তাকে ঠিক পথে আনয়ন করাকে ইসলাম জনগণের অন্যতম কর্তব্য বলে সাব্যস্ত করেছে। রসূলে করীম (সা) বলেন: "কেউ যদি কোন অন্যায় হতে দেখে, তার উচিত তা সংশোধন করা।" তিনি আরও বলেন: "অত্যাচারী শাসকের শাসনে সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।"

এসব নীতির কারণেই তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে লোকেরা যখন বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন—যদিও এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত অধিকতর বিচ্যুতিতে পর্যবসিত হয়।

উপসংহারে আমরা এইসব 'প্রগতিশীল, মুক্ত-বুদ্ধি চিন্তাবিদদের' উদ্দেশ্যে একটি ছোট্ট পরামর্শ দিতে চাই। মুক্তির প্রকৃত পথ ধর্ম বর্জনের পথ নয়, বরং মানুষের মধ্যে এমন এক বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি, যা বেইনসাফীকে খতম করে এবং অত্যাচারীকে সংশোধন করে। আর এটা একান্তভাবেই ইসলামপন্থীদের মনোভঙ্গী।

# ইসলাম ও সভ্যতা

"সেই হাজার বৎসর পূর্বে যখন মানুষ তাঁবুতে বাস করত, সেই যুগে কি তোমরা আমাদের ফিরে নেতে বল? মরুভূমির সেই বন্য ও অসভ্য বেদুঈনদের জন্য ইসলাম ঠিকই ছিল, কারণ এটা এমন একটা সহজ ধর্ম ছিল, যা তাদের কাছে মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় লাগত। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় সুপারসনিক প্লেন, হাইড্রোজেন বোমা ও চলচ্চিত্রের যুগে কি আল্লাহ্‌র ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন সভ্যতা কোন কাজে লাগবে? আজকের উন্নত সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে ইহা চলতে পারবে না। ইহা গতিহীন। সুতরাং দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মত আমাদেরও যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্য ও উন্নত হতে হয় তবে অবশ্যই আমাদের এসব ঝেড়ে মুছে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

মিসরে গত দুই বৎসর যাবত[১] কর্মরত জনৈক 'শিক্ষিত' ইংরেজের সাথে সাক্ষাতকালে উপরোক্ত ধরনের সন্দেহ-সংশয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। মিসরীয় কৃষকদের জীবন-মান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের যে একদল বিশেষজ্ঞ এসেছেন, ইনি তাদেরই একজন। কিন্তু এই জনগণের জন্য তাদের সর্বপ্রকার 'প্রেম' থাকা সত্ত্বেও তারা এদের ভাষা শেখে নি বা শিখতে চেষ্টা করেনি। এ কারণেই মিসর সরকার তাদের ও স্থানীয় কৃষকদের মাঝে দোভাষী হিসাবে আমাকে নিযুক্ত করেন। এতে করেই আমি 'শিক্ষিত' ইংরেজটির সংস্পর্শে আসি।

প্রথমেই তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম যে, আমরা মিসরীয়রা তাদের ঘৃণা করি এবং যতদিন তারা প্রাচ্যে হামলা চালিয়ে যাবে আমরাও তাদের ঘৃণা করে চলব। আমি বললাম, তাদের দোসর আমেরিকা সরকারকেও আমরা মিসর, ফিলিস্তিন প্রভৃতি প্রশ্নে অন্যায় নীতি গ্রহণের কারণে ঘৃণা করি। আশ্চর্য হয়ে তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং পরে বললেন: "আপনি কি কমিউনিস্ট?"

---

১. এ পুস্তকখানি মিসরে সর্বপ্রথম ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

আমি বললাম যে, আমি কমিউনিস্ট নই, মুসলমান। আমি বিশ্বাস করি যে, ধনতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট উভয় সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ইসলামের সভ্যতা। আমি আরও মনে করি যে, মানুষের পরীক্ষিত সমস্ত বিধানের মধ্যে ইসলামী ব্যবস্থাই সর্বোত্তম; কারণ মানুষের সামগ্রিক জীবনই এর আওতাভুক্ত, আর জীবনের বিভিন্ন দিকের একটি সুষ্ঠু ভারসাম্য রয়েছে এতে।

আমাদের আলোচনা এভাবে এগিয়ে চল্‌ল। দীর্ঘ তিন ঘন্টা কথাবার্তা হওয়ার পর তিনি বললেন: "হতে পারে, আপনি ইসলাম সম্বন্ধে যা বলছেন তা সত্য, কিন্তু আমি তো নিজেকে আধুনিক সভ্যতার অবদান থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। প্লেনে ভ্রমণ করা আমি পছন্দ করি, রেডিওতে মনমাতানো সঙ্গীত শুনতে আমার ভাল লাগে। এসব আনন্দ থেকে নিজেকে আমি বঞ্চিত করতে চাই না।"

তাঁর উত্তরে অবাক হয়ে আমি বল্‌লাম: "কিন্তু কে আপনাকে এসব আনন্দ উপভোগে নিষেধ করছে?"

—"ইসলাম গ্রহণ করা অর্থ কি বর্বর যুগে এবং তাঁবুর জীবনে ফিরে যাওয়া নয়?"

এটা সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে এমনি ধরনের সন্দেহ বর্ষণ অবিরাম ধারায় চলেছে, যদিও এসবের কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই। যাঁরাই এই ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন এ ব্যাপারে তাঁরা একমত হবেন। সভ্যতা ও প্রগতির পথে ইসলাম মুহূর্তের তরেও প্রতিবন্ধক হয়নি।

ইসলাম এমন এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা অধিকাংশই ছিল বেদুঈন। তারা এত কঠোর ও নির্মম প্রকৃতির ছিল যে, কুরআন শরীফে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'বেদুঈনরা অধিকতর কপট ও ধর্মবিরোধী।"

ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই যে, ইহা এসব উগ্র ও কঠোর প্রকৃতির বেদুঈনদেরকে একটি মানবিক গুণ সম্পন্ন জাতিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিল। শুধু তারাই যে সৎপথে পরিচালিত এবং পশুত্বের স্তর থেকে মানবিক স্তরে উন্নীত হয়েছিল তা নয়—আল্লাহ্‌র পথে মানবতাকে পরিচালনার নেতৃত্বও তারা লাভ করেছিল। মানুষকে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত করা এবং আত্মার বিকাশ সাধনে ইসলামের অলৌকিক ক্ষমতার ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আত্মার উন্নতি সাধন এমন একটি মহৎ কাজ, যা মানুষের চেষ্টা ও পরিশ্রমের লক্ষ্য হতে পারে; কারণ ইহা সভ্যতার অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু ইসলাম শুধুমাত্র আত্মিক উন্নতিতেই তুষ্ট থাকেনি। আজ যা মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং যাকে অনেকে জীবনের

কেন্দ্রবিন্দু মনে করে, সভ্যতার সেসব তাবৎ সামগ্রীকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। একেশ্বরবাদের খেলাপ না হওয়া পর্যন্ত এবং জনগণকে সৎ কাজ থেকে বিভ্রান্ত না করা পর্যন্ত ইসলাম বিজিত সমস্ত দেশের সভ্যতাকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র সহ সমগ্র গ্রীক বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারকে ইসলাম পৃষ্ঠপোষকতা দান ও সমৃদ্ধ করেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলাম নতুন নতুন অবদান সংযোজন করেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে ইসলাম গভীর ও একনিষ্ঠ আগ্রহ দেখিয়েছে। আন্দালুসিয়ার ইসলামী বৈজ্ঞানিক অবদানের উপরেই ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও তার আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ভিত্তি গড়ে ওঠে।

সুতরাং মানবতার সেবায় নিয়োজিত কোন সভ্যতাকে ইসলাম কবে কোথায় বিরোধিতা করেছে?

আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ইসলামের মনোভাব কি?

অতীতের প্রতিটি সভ্যতার প্রতি ইসলামের যে মনোভাব ছিল বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিও তার সেই একই রূপ মনোভাব। এসব সভ্যতার মহৎ অবদানগুলিকে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর ক্ষতিকর দিকগুলিকে করেছে বর্জন। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদী বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতি ইসলাম কখনই সমর্থন করেনি। ব্যক্তিগত বা বর্ণগত বিবেচনায় ইহা কখনো অন্যান্য সভ্যতার বিরোধিতা করে নি; কারণ মানবজাতির ঐক্য এবং বিভিন্ন বর্ণ ও গোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কে ইহা বিশ্বাস করে। ইসলামী আদর্শ আধুনিক আবিষ্কারের বিরোধিতা করে না। এমনও কোন কথা নেই যে, বাড়ীতে, কারখানায় বা ফার্মে কোন কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হলে তার উপরে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' লিখে নিতে হবে। সেই সব যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা যদি আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র আদর্শে ব্যবহৃত হয় তবেই যথেষ্ট হবে। আসলে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার তো কোন ধর্ম নেই, দেশও নেই—কিন্তু তার ব্যবহারের পদ্ধতিই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ করে থাকে। যেমন, বন্দুক একটি আবিষ্কার মাত্র; এর কোন ধর্ম, বর্ণ বা দেশ নেই। কিন্তু আপনি যদি ইহা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে হামলার কাজে ব্যবহার করেন, তবে আপনি মুসলিমের কাজ করতে পারলেন না। বন্দুক শুধু আক্রমণ প্রতিরোধ এবং বিশ্বে আল্লাহ্‌র বাণী প্রসারের কাজে ব্যবহৃত হোক—ইহাই ইসলামের দাবী।

চলচ্চিত্রও একটি আধুনিক আবিষ্কার। আপনি সৎ মুসলিম হতে পারেন যদি একে সুস্থ আবেগ ও মহৎ চরিত্রের চিত্রায়ন এবং মহৎ মানবতা প্রতিষ্ঠার

উদ্দেশ্যে মানুষে মানুষে সংঘাত রূপায়ণে একে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি যৌন অশ্লীলতা, বেপরোয়া কুপ্রবৃত্তি অথবা নৈতিক, আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক অনাচার চিত্রায়নে একে ব্যবহার করেন তবে আপনি মুসলিমের কাজ করলেন না। এসব চলচ্চিত্র খারাপ ও ক্ষতিকর। শুধু এজন্যে নয় যে, এগুলো মানুষের মধ্যে কুৎসিৎ কামনা ও মানসিকতা জাগিয়ে তোলে, বরং এজন্যেও যে, এতে করে জীবনকে খুব সস্তা ও তুচ্ছ হালকামীতে পরিপূর্ণ একটি সত্তা বলে দেখানো হয়। মানবতার বিকাশে এরা কোন সুস্থ খোরাকই যোগাতে পারে না।

মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যেসব অবদান রেখেছে তা গ্রহণে ইসলামী আদর্শ কখনো বিরোধিতা করেনি। সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করা মুসলমানদের উচিত। রসুল (সা) বলেছেন: "বিজ্ঞান সাধনা একটি পবিত্র বিধান।" একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞান সাধনার অর্থ সর্বপ্রকার জ্ঞান সাধনা। সর্বত্র সর্বপ্রকার জ্ঞান সাধনার জন্য রসুল (সা) মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

উপসংহারে বলা চলে—সভ্যতা যতক্ষণ পর্যন্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে, ইসলাম তার বিরোধিতা করে না। কিন্তু সভ্যতার অর্থ যদি হয় মদ্যপান, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, উপনিবেশবাদ এবং বিভিন্ন ছুতায় মানুষকে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, তা হলে ইসলাম অবশ্যই এ ধরনের তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে এবং এর মায়া-মরীচিকার কবল থেকে মানবতাকে রক্ষার জন্য সম্ভবপর সকল কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।

# ইসলামের বিজয় কোন্ পথে ?

ইসলাম আমাদের সামনে যে আদর্শ তুলে ধরে, তার বাস্তবায়নের জন্য অ
কি করা উচিত? আমরা জেনেছি ইসলাম দুনিয়ার সবচাইতে সেরা ব্যবস্থ
আমাদের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থান প্রমাণ কর
একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই আমরা এ দুনিয়ায় আমাদের ইযযত, নেতৃত্ব ও সা
ইনসাফ পুনরুদ্ধার করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজকের বিরুদ্ধবাদী
মুকাবিলায় এবং কিছু কিছু মুসলিম ভূখণ্ডে স্বৈরতন্ত্রী শাসকরা যখন ব
শত্রুর চাইতে কঠোরতরভাবে ইসলামী আদর্শের বিরোধিতা করে, তখন
মুকাবিলায় ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের পক্ষে কোন্ পথে অগ্রসর হতে হ

হ্যাঁ, কোন্ পথে আমাদের অগ্রসর হতে হবে? এবং আমাদের কি
হবে? উত্তর হল, মানব ইতিহাসের অন্যান্য আন্দোলনের ব্যাপারে যেমনটি
গেছে, তেমনটি এরও একটিই এবং মাত্র একটি পথই রয়েছে এবং এক
তা হল: বিশ্বাস।

প্রথম যুগে মুসলমানদের এই বিশ্বাসই শক্তি যুগিয়েছিল। আজও ত
বর্তমান উত্তরপুরুষকে সাহায্য করবার শক্তি কেবল এটাই। মুসলমান হি
আমাদের অবস্থা ও অবস্থান প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের চাইতে কোন অ
পৃথক নয়। নগণ্য সংখ্যক লোক হয়েও তারা সেকালের দুই-দুটি পরাক্রমশা
উদ্ধত রাষ্ট্রশক্তি তাদের বামদিকের রোমান সাম্রাজ্য এবং ডান দিকের প
সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাদের এই দুশমনের উভয়ই তা
তুলনায় লোক-লস্কর, বৈষয়িক সম্পদ, যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধবিজ্ঞান ও রাজনৈ
অন্তর্দৃষ্টির বিচারে অনেক উন্নত ছিল। এতসব সত্ত্বেও অলৌকিক ব্যাপ
সংঘটিত হয়ে গেল। অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে অল্পসংখ্যক মুসলমান
সীজার ও খসরু—উভয়কে পরাভূত করে দিল। ভারত মহাসাগর থেকে আটলা
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাদের হাত থেকে দখল করে নিল। এই অলৌকিক
কেমন করে সম্ভব হল?

ইতিহাসের কোন বস্তুবাদী বিশ্লেষণই এই অলৌকিক ঘটনার সম্যক ব্যা
দিতে পারে না। কেবল একটি মাত্র বিষয়ই এই মহারহস্যের জট খুলতে প

এবং তা হচ্ছে ঈমান। এই ঈমানই প্রথম যুগের জনৈক মুসলমানকে বুক টান করে একথা ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল: একথা কি সত্য নয় যে, আমি যদি এই লোকের (অবিশ্বাসী) সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করি অথবা নিজে নিহত হই, তাহলে আমার আর বেহেশতের মধ্যে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না'? একথা বলে সে যুগের মুজাহিদ এমন সহজ ভঙ্গীতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। যেন তিনি তাঁর নববধূকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন। অথবা তিনি হয়ত তাঁর শত্রুকে একথা বলতে বলতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, "আমাদের জন্য কি বিজয় অথবা শাহাদত—এই দু'টি উৎকৃষ্ট বস্তু নিয়ে তোমরা অপেক্ষা করছ?" আমাদের লক্ষ্য অর্জন করার এটাই যথার্থ পন্থা এবং মানব ইতিহাসের যে কোন আদর্শবাদী আন্দোলনের জন্য এটাই একমাত্র পথ।

কিছু লোক আছে যারা আমাদের প্রশ্ন করবে, এ জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার কোথায়? এসব প্রশ্নকারীদের কেউ আন্তরিকতার বশবর্তী হয়েই এ প্রশ্ন করবে, অন্যরা প্রশ্ন করবে তাদের পরাজয়ী মনোবৃত্তি থেকে হাতিয়ারের প্রশ্ন? হ্যাঁ, হাতিয়ারের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের সর্বপ্রথম ও সবচাইতে বড় প্রয়োজন হাতিয়ার নয়, কারণ শুধুমাত্র হাতিয়ার দিয়ে এক্ষেত্রে কোন জাতির কোন উপকার হতে পারে না। বিগত বিশ্বযুদ্ধে ইতালীদের হাতে ছিল সবচাইতে কার্যকর ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, তবুও এগুলো তাদের বাঁচাতে পারেনি। এমনকি এর দ্বারা তারা কোন গৌরব-জনক বিজয়ও অর্জন করতে পারল না। তারা শুধু একটা ব্যাপারে—সম্ভবত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর জন্য ফেলে রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে পারঙ্গমতা দেখাতে পেরেছিল। তাদের অভাব ছিল অস্ত্রশস্ত্রের নয়—বিশ্বাস ও প্রেরণার।

অপরদিকে আমরা দেখতে পাই অনুপ্রাণিত যোদ্ধাদের একটি ক্ষুদ্র দল, যাদের মোট সংখ্যা একশতের বেশী হবে না এবং যাদের নৈশ অভিযানকারীদের দলে কখনও ছয়-সাত জনের বেশী লোক থাকত না, তারা প্রাচীন সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দকে এত বেশী ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল যে, তারা ঐ ক্ষুদ্র যোদ্ধা দলকে পরাস্ত করার বদলে তাদের হাতে দেশ ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়াই অধিকতর পছন্দ করেছিল। বিশ্বাসী যোদ্ধাদের এই ক্ষুদ্র দলের নিকট কোন মারাত্মক হাতিয়ার ছিল না: ভারী আর্টিলারী, জেট-ফাইটার অথবা আর্মর্ড কোর তাদের ছিল না। তারা সাধারণ পিস্তল, বন্দুক ও রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করেছিল। তবে শত্রুদের তুলনায় একটা অনেক বেশী কার্যকর হাতিয়ার তাদের ছিল—তাদের ছিল বিশ্বাস। তাদের মধ্যে ছিল প্রথম যুগের মুসলমানদের প্রেরণা—আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম

করে অবিশ্বাসীদের কতল করা অথবা নিজেরা শহীদ হবার প্রেরণা। এভাবেই তারা প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল।

আমরা জানি আমাদের জন্য আমরা যে পথ বেছে নিয়েছি তা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ বরং এমন এক পথ, যা শ্রম, রক্ত ও অশ্রুর আহ্বান জানায়। কুরবানী, আত্মদান, মহাপরীক্ষা এবং সর্বস্ব ত্যাগের সদাপ্রস্তুতি এর দাবী। কিন্তু এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ অন্যান্য যে কোন আদর্শবাদী আন্দোলন সম্বন্ধেও একথা খাটে। আত্মত্যাগের প্রয়োজন অপরিহার্য। সাফল্যের কোন শর্টকাট, সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

তবে আমরা কেন আমাদের মহৎ লক্ষ্যের জন্য—মর্যাদা, গৌরব ও সামাজিক ইনসাফের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম ও কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকব না? জিল্লতী, অসম্মান, দারিদ্র্য, অসহায়তা ও বিশৃঙ্খলার কারণে যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে ইতিমধ্যেই আমরা বাধ্য হয়েছি তার তুলনায় ইসলামের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার কিছুতেই অধিক ও কঠোরতর হবে না। বিগত বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন আরব দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে। মিত্রশক্তির বিমান থেকে বোমা-বর্ষণে হাজার হাজার মানুষ ধ্বংস হয়েছে; সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে প্রচুর এবং বিপুল সংখ্যক লোককে বন্দী করা হয়েছে, বিজয়ী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করেও বহু সম্পদশালীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমাদের এতসব জিল্লতীর পরেও মিঃ চার্চিলের মন ওঠল না। তিনি নির্লজ্জভাবে আমাদের বলে বসলেন: "আমরা তোমাদের রক্ষা করেছি। এখন এর মূল্য পরিশোধ করে দাও।"

অল্প কিছু দিন আগে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তাদের সাথে একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদনে আরবদের রাযী করাতে ব্যগ্র ছিল। তাদের আসল মতলব ছিল তাদের সেনাবাহিনীতে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ আরব ভর্তি করা, যাতে করে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সাদা আদমীদেরকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করে আরবদেরকে এসব অস্ত্রশস্ত্রের খোরাক করা যায়। এ কাজ করতে যেয়ে তারা আরব জগতের খাদ্য উৎপাদন জবরদখল করে নেয় এবং আরব জনগণকে জিল্লতী ও অসম্মানের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তারা ওদেরকে লাথি মেরে দূর করে দেয়। মৃত্যুর হাত থেকে, আত্মত্যাগ ও মহাপরীক্ষার হাত থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। তুচ্ছ ও অগৌরবজনক কাজেও মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকে। গত বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করতে যেয়ে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে। তাহলে আমরা ইসলামের জন্য গৌরব ও সত্যের জন্য প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হব কেন? এখন ইসলামের জন্য পাঁচ লক্ষ লোক (মিত্রশক্তির জন্য যতক্ষণ প্রাণ দিয়েছে) প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে, তার পরিণাম ফল ভিন্ন হতে বাধ্য। তখন এ বিশ্বে একজনও স্বেরাচারী বা জালিম থাকতে পারবে না, তখন খৃস্টান বা অখৃস্টান কোন

সাম্রাজ্যবাদই বিশ্বে থাকতে পারবে না। এর থেকে কি বোঝা যায় না—আমরা আমাদের লক্ষ্য কোন্ পথে হাসিল করতে পারি? ওটাই পথ।

কিছু লোক আধুনিক বিশ্বে কমিউনিজমের প্রসারে উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে আতঙ্কিত হবার কোনই কারণ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব পরিস্থিতি এতটুকু পরিবর্তিত হয়নি। বর্তমানে যে সব দেশ কমিউনিস্ট শাসনাধীনে রয়েছে, কমিউনিজমের পূর্বে এগুলো ছিল খৃস্টান প্রভাবাধীন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আজকের মতই শত্রু ভাবাপন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়ার কথা বলা যায়—কমিউনিস্ট বিপ্লবের পূর্বেও সেদেশ থেকে বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ও অন্তরকোন্দল বাধানোর চেষ্টা করা হতো। একই অবস্থা ছিল ইউরোপেও। অতীতেও এরা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালিয়েছে এবং আজও তারা এ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান বা ইসলামের জন্য অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি।

এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও অবশ্য অবশ্যই অপরিবর্তিত থাকবে। ইসলামের প্রথম যুগে যেমন মুসলমানরা বাম ও ডান—দুই দিক থেকেই সেকালের দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, আমাদের আজকের অবস্থানও ঠিক তদ্রূপ। আনন্দের কথা সর্বপ্রকারের বাধাবিপত্তি এবং কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও বিশ্বে ইসলামের আওয়াজ প্রতিদিনই বুলন্দ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইসলামের পুনরুজ্জীবন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগের মতই আজকের বিশ্বেও ইসলাম এক গৌরবজনক ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। পাশবিক ভোগ-লালসা ও লাভালাভে উন্মত্ত আজকের বিশ্ব দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলায় যখন ডুবে যেতে বসেছে, তখন একমাত্র ইসলামই একে শান্তি ও স্বস্তির প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। জড় ও আত্মার সমন্বয় ঘটিয়ে মানবতাকে আজকের নাজুক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। এমতাবস্থায় আজ হোক বা কাল হোক ইসলামের গুরুত্ব অনুধাবন করতে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ না করলেও ইসলামের মূলনীতিসমূহ গ্রহণ করতে বিশ্ব বাধ্য।

আমরা যারা ইসলামের কর্মী, তাদের বক্তব্য, আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে, আমাদের সামনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমাদের মুসলমানদের আত্মত্যাগ করতে হবে, কঠিন ও অপরিমেয় আত্মত্যাগের মাধ্যমে পৃথিবীকে ইসলামের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্য সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে একথাও সর্বদা মনে রাখতে হবে, এ লক্ষ্যে পৌঁছার একমাত্র পথ আত্ম-উৎসর্গের পথ: "আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (আল-কুরআন— ২২ : ৪০)

———



ই.ফা.বা—৮৮-৮৯—প্র/৩৪৯৫(উ)—৫২৫০

করে
তারা

এ বরং
মহাপ
কিছু
আন্ত

ইনগা
অগম্ম
ইতিম
ও কা
আরব
বর্ষণে
এবং
গ্রহণ
ভিন্ন
বগলে

চুক্তি
ছিল
আমে
রক্ষা
মেয়ে
জনগ
তারা
মহাপ
মানু
কমপ
ও স
পাঁচ
প্রস্তু
স্থের

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদে